সৈয়দ মুজতবা আলী

রচনাবলী

সৈয়দ মুজতবা আলী

সৈয়দ মুজতবা আলী

সৈয়দ মুজতবা আলীর জন্ম হয় ১৯০৪ সালের শেষের দিকে করিমগঞ্জ শহরে। ১৯৪৭ সালের দেশ বিভাগের আগে করিমগঞ্জ শহর সিলেট জেলার ভিতরে ছিল। বর্তমানে করিমগঞ্জ আসাম প্রদেশের কাছাড় জেলার অন্তর্ভুক্ত। আমাদের পিতা সৈয়দ সিকান্দার আলী (পরে খানবাহাদুর) তখন সেখানে রেজিস্ট্রেশন বিভাগে চাকরি করতেন। আমাদের আম্মার নাম আমতুন মান্নান খাতুন।

মুজতবা আলীর বাল্যজীবনের একটি ঘটনা থেকে তার সাহসের পরিচয় পাওয়া যায়। তার বয়স যখন পাঁচ তখন মিঃ জে. হেজলেট আই. সি. এস. (ইনস্‌পেক্টর জেনারেল অফ রেজিস্ট্রেশন) আসেন চাড়াভাঙ্গায় বাবার অফিস পরিদর্শন করতে। সেই নিভৃত পল্লীঅঞ্চলে ইংরেজ সাহেবের আগমন চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করল। অফিসের বারান্দা লোকে লোকারণ্য। সাহেব নিবিষ্ট মনে অফিসের কাজ পরিদর্শন করছেন। তাঁর বাম হাতে বাঁধা মূল্যবান হাতঘড়ি। সকলের দৃষ্টি এড়িয়ে মুজতবা আলী সাহেবের কবজিতে বাঁধা রিস্টওয়াচে হাত রাখল। হেজলেট সাহেব ছিলেন অমায়িক ব্যক্তি। তিনি হেসে জানতে চাইলেন ছেলেটি কে ? বাবা কাছেই ছিলেন। পুত্রের আচরণে লজ্জিত হলেন। সাহেব হেসে বললেন, 'নেভার মাইন্ড, হি উইল বি এ জিনিয়াস!' এই ঘটনাটি আমার জ্যেষ্ঠভ্রাতা সৈয়দ মুস্তাফা আলীর আত্মস্মৃতিতে উল্লেখ করা হয়েছে।

ছাত্রজীবনেই তার সাহিত্যপ্রীতির উন্মেষ ঘটে। তখনই সে ছিল ওমর খৈয়ামের রুবাইয়াতের উৎসাহী পাঠক। তখন সবেমাত্র কান্তিচন্দ্র ঘোষের রুবাইয়াতের অনুবাদ প্রমথ চৌধুরীর ভূমিকাসহ প্রকাশিত হয়ে সঙ্গে সঙ্গে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। মুজতবা আলীর ঝোঁক চাপল রুবাইয়াতের বিভিন্ন বাংলা ও ইংরাজী অনুবাদ সংগ্রহ করার দিকে। সে ফিটজেরাল্ডের অনুবাদের বিভিন্ন সংস্করণ উইন্ডফিল্ডের অনুবাদ সত্যেন দত্ত ও কান্তি ঘোষের অনুবাদ সংগ্রহ করে গভীর মনোযোগের সঙ্গে পড়ত। পরবর্তী জীবনে নজরুল ইসলামের রুবাইয়াতের অনুবাদে এক পান্ডিত্যপূর্ণ ও সরস ভূমিকা লেখে। ১৯২১ সালে দেশে অসহযোগ আন্দোলনের প্রবল বন্যা আসে। সৈয়দ মুজতবা আলী তখন সিলেটে সরকারী হাই স্কুলে ক্লাস নাইনে পড়ে। সে তখন ক্লাসের ফার্স্ট বয়। সরস্বতী পূজার সময়ে কয়েকটি হিন্দু ছাত্র ডেপুটি কমিশনারের বাংলো থেকে ফুল চুরি করে। পরের দিন ডেপুটি কমিশনার ডসন সাহেব (I.A.Dawson) চুরির খবর পেয়ে দোষী ছেলেদের ডেকে পাঠান। ছেলেরা উপস্থিত হলে ডেপুটি কমিশনারের হুকুমে চাপরাসীরা ছেলেদের দু-এক ঘা বেত মারে। তখন দেশের রাজনৈতিক আবহাওয়া উত্তপ্ত। ছেলেরা আরম্ভ করল ধর্মঘট। কর্তৃপক্ষ প্রমাদ গুনলেন। তখন যেসব সরকারী কর্মচারীর পুত্রেরা ধর্মঘটে যোগ দিয়েছিল তাদের অভিভাবকদের উপর কর্তৃপক্ষ চাপ দিলেন। আমার বাবা তখন ডিস্ট্রিক্ট সাবরেজিস্ট্রার। (আসামে তখন এ চাকুরির নাম ছিল– স্পেশাল সাবরেজিস্টার) ডেপুটি কমিশনার বাবাকে ডেকে নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করলেন। বাবা মুজতবাকে স্কুলে ফিরে যেতে বলেন। মুজতবা আলী কিন্তু দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। তার মনোভাব অনমনীয়। সে কিছুতেই

স্কুলে ফিরে যেতে রাজী হল না। আমার বাবার মনে হল তাকে সিলেটের রাজনৈতিক আবহাওয়া থেকে দূরে সরাতে পারলে বোধ হয় সব দিক দিয়ে সুবিধা হবে।

ইতিপূর্বে ১৯১৯ সালে রবীন্দ্রনাথ যখন সিলেটে আসেন তখন তিনি ছাত্রদের কাছে আকাঙ্খা সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন। মুজতবা আলীর বয়স তখন চৌদ্দ বছর। বক্তৃতা শুনে কারও সঙ্গে পরামর্শ না করে সে রবীন্দ্রনাথের কাছে চিঠি লেখে। চিঠিতে জিজ্ঞাসা ছিল, 'আকাঙ্খা উচ্চ করতে হলে কি করা প্রয়োজন ?' রবীন্দ্রনাথ সিলেট থেকে আগরতলা গিয়েছিলেন। কবির সিলেট ত্যাগের সপ্তাহখানেক পরে আশমানী রঙের খামে ও আশমানী রঙের চিঠির কাগজে মুজতবা আলীর নামে আগরতলা থেকে কবির নিজের হাতের লেখা জবাব এল। ১০/১২ লাইনের এই চিঠির মর্ম ছিল, আকাঙ্খা উচ্চ করিতে হইবে–এই কথাটার মোটামুটি অর্থ এই—স্বার্থই যেন মানুষের কাম্য না হয়। দেশের মঙ্গলের জন্য ও জনসেবার জন্য স্বতঃস্ফূর্ত উদ্যোগ কামনাই মানুষকে কল্যাণের পথে নিয়ে যায়। তোমার পক্ষে কি করা উচিত তা এতদূর থেকে বলে দেওয়া সম্ভব নয়। তবে তোমার অন্তরের শুভেচ্ছাই তোমাকেই কল্যাণের পথে নিয়ে যাবে।' অপ্রত্যাশিত এই চিঠি আমাদের পরিবারে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে। তখন থেকেই বিশ্বকবির সান্নিধ্যলাভের আগ্রহ মুজতবা আলীর হৃদয়ে জাগ্রত হয়। বাবা তাকে সরকারী স্কুলে ফিরে যেতে বললে সে শান্তিনিকেতন যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করে। তখন সবেমাত্র বিশ্বভারতী স্থাপিত হয়েছে। মুজতবা আলী বোধ হয় বিশ্বভারতীর কলেজ বিভাগে প্রথম বাইরের ছাত্র। তখন রবীন্দ্রনাথ নিজেই বিশ্বভারতীতে পড়াতেন। মুজতবা আলী তাঁর কাছে বলাকা, শেলি ও কীটসের কাব্য অধ্যয়ন করার সৌভাগ্য লাভ করে। একাদিক্রমে পাঁচ বছর অধ্যয়ন করে সে বিশ্বভারতীর স্নাতক হয়। মুজতবা আলী ও গুজরাটের বাঙ্কুভাই শুক্লাই বোধ হয় বিশ্বভারতীর প্রথম বছরের গ্রাজুয়েট।

বাল্যকালে মুজতবা আলীর চেহারা অত্যন্ত সুন্দর ছিল। তার বর্ণ গৌর ছিল। মুখের রেখা ছিল ধারালো। শেষ জীবনের মাথাজোড়া টাক থেকে তার যৌবনকালের চেহারার হদিস পাওয়া কঠিন ছিল। বাস্তবিকই সে যৌবনে ছিল কাঞ্চনকান্তি সুপুরুষ। তার ডাকনাম ছিল সিতারা বা নক্ষত্র। সিতারা শব্দ পরে সিতু রূপে সংক্ষিপ্ত হয়। তাই মুজতবা আলী মার্জার-নিধন কাব্যে লিখেছে–

"বাণীরে বন্দিয়া কেচ্ছা খতম বয়ান
দীন সিতু মিয়া ভণে শুন পুণ্যবান।"

শান্তিনিকেতনের পড়া শেষ করে মুজতবা আলী কিছুকাল আলিগড়ে পড়াশুনা করে। সেখানকার পরিবেশ তাকে আকৃষ্ট করতে পারে নি। যদিও সে সেখানে জনপ্রিয়তা অর্জন করে ও ছাত্র ইউনিয়নের ভাইস প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়।

এই সময়ে তার কাবুল যাওয়ার সুযোগ হয়। আমানুল্লাহ্ খান তখন আফগানিস্তানে। ব্যাপক শিক্ষা সংস্কারে মনোযোগী হয়েছেন। শান্তিনিকেতন থেকে ফরাসী অধ্যাপক বেনোয়া ও রাশিয়ান অধ্যাপক বগদানভ্ তখন কাবুলের শিক্ষাবিভাগে যোগ দিয়েছেন। তাঁদের সাহায্যে সে কাবুল শিক্ষা-বিভাগে চাকরি পায়। তার দায়িত্ব ছিল কৃষিবিজ্ঞান কলেজে সাধারণ বিষয়ে অধ্যাপনা। কাবুলে প্রায় দুই বছর থেকে সে ১৯২৯ সালের

মাঝামাঝি দেশে ফিরে আসে। ইতিমধ্যে বাচ্চাই সাকো কাবুলের বাদশাহ হয়েছেন। পড়াশুনার কাজ বন্ধ হয়ে গিয়েছে। আফগানিস্তান থেকে ফিরতে তাকে অনেক বেগ পেতে হয়। আমার আব্বা তৎকালীন ভারতীয় লোকসভার সহ-সভাপতি। সিলেটের সুসন্তান আবদুল মতীন চৌধুরীর সাহায্যে মুজতবা আলীর দেশে ফেরার ব্যবস্থা করে। মুজতবা আলীর কাবুল-প্রবাসজীবনের সরস বর্ণনা আছে ' দেশে-বিদেশে' বইতে। কাবুল থেকে ফিরে এলে মুজতবা আলী বিদেশে যেতে আগ্রহী হয়। এই সময় বিশ্বভারতীর ডিগ্রী বিদেশে স্বীকৃতিলাভ করে নি। শুধু ব্রিটিশের হাতে পরাজিত জার্মান সরকার বিশ্বভারতী ও জামিয়া-মিলিয়া ইত্যাদি স্বদেশী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে স্বীকৃতি দিত। মুজতবা আলী Wilhelm Humboldt নামক জার্মান প্রতিষ্ঠান থেকে একশত পঞ্চাশ টাকা মাসিক বৃত্তি লাভ করে। এই বৃত্তি জার্মানীতে পড়াশুনা নির্বাহের পক্ষে যথেষ্ট ছিল না। আমি তাকে মাসে একশ টাকা করে পাঠাতাম। মুজতবা আলী প্রথমে বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়। কিন্তু বার্লিনের মত বড় শহরের হট্টগোল তার সহ্য হয় নি। কয়েক মাস পরে সে বন বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেয়। এখানে দুই বছর পড়াশুনা করে সে পি-এইচ-ডি ডিগ্রী অর্জন করে। তার গবেষণার বিষয় ছিল 'The origin of the khozhas and ther religious life to-day'. জার্মানী থেকে শিক্ষা সমাপন করে সে ১৯৩২ সালে দেশে ফিরে আসে।

এর পর সে পুনরায় ইউরোপ যায় ও ইউরোপ থেকে কায়রো গিয়ে আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনা করে। সে যখন কায়রোতে তখন বরোদার মহারাজা সয়াজীরাও গাইকোয়াড় আল-আজহার পরিদর্শনে যান।

এখানে মহারাজাকে মুজতবা আলীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়। মহারাজা তার পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হন এবং দেশে ফিরলে তাকে মহারাজার সঙ্গে দেখা করতে অনুরোধ করেন। ১৯৪৩ সালে দেশে ফিরে মুজতবা আলী বরোদায় যায়। মহারাজা তাকে বরোদা কলেজে অধ্যক্ষ নিযুক্ত করেন। মুজতবা আলী প্রায় আট বৎসর বরোদায় অধ্যাপনা করে। এই সময়ে সে গুজরাটের একখানি আরবী ইতিহাস সম্পাদনা করতে শুরু করে। এই কাজ সে শেষ করতে পারে নি। সয়াজীরাও মুজতবা আলীকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন ও বিদেশী পন্ডিতদের কাছে পরিচিত করিয়ে দিতেন। মহারাজার মৃত্যুর পর বরোদার পরিবেশ মুজতবা আলীর কাছে প্রীতিকর মনে হয় নি। তখন সে বরোদার চাকরি ছেড়ে দিয়ে কলিকাতায় চলে আসে। এই সময় থেকে সে দীর্ঘকাল ৫ পার্ল রোডে তার বন্ধু আবু সৈয়দ আইয়ুবের সাহচার্যে বাস করে। আইয়ুব যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হয়ে দক্ষিণ ভারতের মদনাপল্লী যান। মুজতবা আলী তাঁর অনুগমন করেন। এই সময়ে সে কিছুকাল বাঙ্গালোরে বাস করে। বাঙ্গালোরে অবস্থানকালেই সে দেশে-বিদেশে লেখার কাজে হাত দেয়।

মুজতবা আলী পরিণত বয়সে সাহিত্যকর্মে ব্রতী হয়। ১৩৪২ সালের মোহম্মদী পত্রিকায় তার মিশরের শিক্ষায়তন শীর্ষক একটা প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। ১৯৩৯ সালে মে মাসে সে সিলেট শহরে কেন্দ্রীয় মুসলিম সাহিত্য সংসদের দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতিত্ব করে। তার ভাষণ মাসিক মোহম্মদী ও সিলেটের আল-ইস্‌লাহ পত্রিকায় ছাপা হয়।

এর পর সে আনন্দবাজারে সত্যপীর ও টেকচাঁদ নামে একটি 'কলম' লিখতে আরম্ভ করে। মুজতবা 'রায়পিথৌরা' এই ছদ্মনামে হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড কাগজেও লিখেছে।

১৯৪৮ সালে সে দেশ পত্রিকায় 'দেশে-বিদেশে' লিখতে আরম্ভ করে। এই বই প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৪৯ সালে। প্রকাশক ছিলেন নিউ এজ পাবলিশার্স। প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই এই বই জনপ্রিয়তা অর্জন করে।

রম্যরচনার ক্ষেত্রে নূতন প্রকাশভঙ্গিতে যে লেখক প্রথম জনপ্রিয়তা অর্জন করেন তিনি যাযাবর। তাঁর অনবদ্য সুন্দর প্রথম গ্রন্থ 'দৃষ্টিপাত' বিস্ময়ের দৃষ্টি নিয়ে সাহিত্যক্ষেত্রে প্রবেশ করে। এর পরেই মুজতবা আলী এই ক্ষেত্রে সুনাম অর্জন করেছে। তার রচনাশৈলীর একটি স্বকীয় বৈশিষ্ট্য আছে। সে তার মনের ভাব বাচনভঙ্গীর ওপর এঁকে দিতে সমর্থ হয়েছিল। সে অনেক আরবী ফারসী শব্দ ও পূর্ববঙ্গের আঞ্চলিক শব্দকে বাংলাভাষায় প্রতিষ্ঠিত করতে সমর্থ হয়েছে। তার কলমের গুণে তার ব্যবহৃত নতুন শব্দ আঞ্চলিকতাকে অতিক্রম করে গিয়েছে। তার ভাষায় ফরাসী গদ্যসাহিত্যের প্রাঞ্জলতা স্বচ্ছতা ও বুদ্ধিদীপ্ত তীক্ষ্ণতা দেখতে পাওয়া যায়। লঘুচালের ভাষায় বুদ্ধিদীপ্ত রচনাশৈলীতে চমক ও শ্লেষের ব্যবহারে সে এক অভিনব রম্যসাহিত্য সৃষ্টি করেছে। অতি সাধারণ ঘটনাকে তীক্ষ্ণ-পর্যবেক্ষণ-শক্তি আতস কাঁচের ভেতর দিয়ে তাকে তীব্রতর স্বচ্ছ রূপপ্রদানের ক্ষমতা তার অসাধারণ।

১৯৪৯ সালে মুজতবা আলী বগুড়া কলেজে অধ্যক্ষরূপে যোগদান করে। তার প্রগতিশীল মতবাদ কর্তৃপক্ষ সুনজরে দেখেন নি। তার বিরুদ্ধে অন্যতম অভিযোগ ছিল, কলেজ ম্যাগাজিনে একটি প্রবন্ধে একজন মন্ত্রীর বিরুদ্ধে অশোভন মন্তব্য করা হয়েছিল। তার লেখা পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা পুস্তিকা কর্তৃপক্ষ সুনজরে দেখেন নি। এই সকল কারণে সে বাংলাদেশ ছাড়তে বাধ্য হয় ও ভারতীয় নাগরিকত্ব গ্রহণ করে।

পরে সে প্রায় সাত বৎসর অল ইন্ডিয়া রেডিওর কটক স্টেশনের ডিরেক্টার ছিল। এই সময়টা তার সুখে কাটে। এসময় বিশ্বভারতীয় প্রাক্তন ছাত্র নবকৃষ্ণ চৌধুরী উড়িষ্যার মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন। এর পরে সে পাটনা ও দিল্লীতে অল ইন্ডিয়া রেডিওর সঙ্গে যুক্ত ছিল। অল ইন্ডিয়া রেডিওর চাকুরি করার আগে সে ভারত গবর্ণমেন্টের Cultural Relation সংস্থার সেক্রেটারী ছিল। অল ইন্ডিয়া রেডিওর চাকরি ছেড়ে শান্তিনিকেতনে সে জার্মান ভাষা অধ্যাপনা করতো। পরে সে বিশ্বভারতীর ইসলামিক কালচার বিভাগের অধ্যাপক নিযুক্ত হয়।

মুজতবা আলী ছিল বহুভাষাবিদ। ফরাসী, জার্মান, ইটালিয়ান ইত্যাদি ইউরোপীয় ভাষা ও আরবী, ফারসী, উর্দু, হিন্দী, সংস্কৃত, গুজরাটী, মারাঠী ইত্যাদি প্রাচ্য ও ভারতীয় ভাষায় তার দখল ছিল। সে পনেরোটি ভাষা জানতো।

তার প্রকাশিত গ্রন্থের নাম নিম্নে দেওয়া গেল–দেশে-বিদেশে, চাচা-কাহিনী, পঞ্চতন্ত্র (১ম ও ২য় পর্ব), ময়ূরকণ্ঠী, অবিশ্বাস্য, ধূপছায়া, চতুরঙ্গ, দ্বন্দুমধুর, ভবঘুরে, টুনিমেম, দু'হারা, হাস্যমধুর, প্রেম, জলেডাঙায়, শবনম্, শহর ইয়ার, বড়বাবু, পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা, কত না অশ্রুজল, হিটলার ইত্যাদি। দ্বন্দুমধুর মুজতবা আলী ও রঞ্জনের উভয়ের রচনার সংকলন। এ সকল বই ছাড়া তার শ্রেষ্ঠ গল্প, শ্রেষ্ঠ রম্যরচনা, পছন্দসই, বহু-বিচিত্র

ইত্যাদি সংকলন প্রকাশিত হয়েছে। তার আর একখানা বই 'তুলনাহীনা' তার মৃত্যুর পর প্রকাশিত হয়েছে। মৃত্যুর অল্পকাল পূর্বে সে পূর্বদেশ পত্রিকায় 'পরিবর্তনে অপরিবর্তনীয়' নামে একটি ধারাবাহিক রচনা লেখে।

১৯৫১ সালের ১১ মার্চ তিনি ঢাকা শহরে রাবেয়া খাতুনের সঙ্গে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হন। রাবেয়া খাতুন ১৯৭২ সালে অ্যাসিস্টান্ট ডি. পি. আই. পদ থেকে অবসর নিয়েছেন। মুজতবা আলীর দুই পুত্র সৈয়দ মশাররফ আলী ও সৈয়দ জগলুল আলী।

মুজতবা আলী ছিল আমার আব্বার কনিষ্ঠ পুত্র। তার জন্মের পরেই আমার আব্বার চাকুরিতে উন্নতি হয়েছিল। এই কনিষ্ঠ পুত্রের প্রতি আব্বা ছিলেন অত্যন্ত স্নেহশীল। মুজতবা আলী বন থেকে ডক্টরেট নিয়ে এলে তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হন। তিনি মুজতবার থিসিস সর্বদা তাঁর সঙ্গে রাখতেন। তাঁর ওফাত হয় ১৯৩৯ সালে ৭৪ বছর বয়সে। ১৯৪৮ সালে মুজতবা আলী সাহিত্যের ক্ষেত্রে বিশেষ খ্যাতিলাভ করে। পরম পরিতাপের বিষয় আমাদের আব্বা মুজতবা আলীর সাহিত্যখ্যাতি চোখে দেখে যেতে পারেন নি।

সৈয়দ মুর্তাজা আলী

ভূমিকা

সৈয়দ মুজতবা আলীর রচনার কোনো পরিচিতি দরকার হয় না, ভূমিকা তো একেবারেই অনাবশ্যক, বলতে গেলে আনুষ্ঠানিকতা মাত্র। তাঁর লেখা পড়া-মাত্র চেনা যায় এবং বোঝা যায় এ রচনা অন্য কারুরই নয়, হওয়া সম্ভবও নয়। যাঁরা পড়েছেন তাঁরা তো মুজতবা আলীর লেখার আকর্ষণ কতটা তা জানেনই, যাঁরা আগে পড়েন নি তাঁরাও পড়তে শুরু করলেই টের পেয়ে যাবেন এই লেখক কেমন অসামান্য। সৈয়দ মুজতবা আলীর রচনাবলীর প্রথম খণ্ডে তাঁর চারটি রচনা রয়েছে, প্রথমটি ভ্রমণকাহিনী, *দেশে বিদেশে* (১৯৪৯); দ্বিতীয়টি উপন্যাস, *অবিশ্বাস্য* (১৯৫৪), এর পরেরটি গল্প কাহিনীর সঙ্কলন *চাচা কাহিনী* (১৯৫৯) এবং চতুর্থটি প্রবন্ধ, *পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা* (১৯৪৭)। চারটি চার বিষয়ে লেখা, চার ধরনেরও বলা যাবে, কিন্তু সবক'টিতেই মুজতবা আলী আছেন, রয়েছে তাঁর নিজস্ব গুণগুলো।

তালিকা তৈরি নিষ্প্রয়োজন, কেননা, মুজতবা আলীর রচনার গুণগুলো একেবারেই স্বতঃপ্রকাশ। যেমন তাঁর প্রসন্নতা। তাঁর সব লেখার ভেতরই একটি প্রসন্নতা বিদ্যমান, সে-লেখা গল্পই হোক, হোক ভ্রমণকাহিনী কিংবা প্রবন্ধ। যখন তিনি যুক্তি দিচ্ছেন, বলা যায় বিতর্কে লিপ্ত হতে বাধ্য হয়েছেন, যেমনটা ঘটেছে *পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা* বইটিতে, তখনও তাঁর সুর, স্বর, ভঙ্গি উপস্থাপনা সবই অত্যন্ত প্রসন্ন। কোনো বিরক্তি নেই। আর যখন হাল্কা মেজাজে কথা বলেন, যেমন *দেশে বিদেশে* ও *চাচা কাহিনীতে* তখন তো কথাই নেই, তিনি রীতিমত আমুদে। মুজতবা আলী যে গল্প বলতে জানেন তাতে সন্দেহ করবে কে। সে-গল্প শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পাঠকের কৌতূহলকে ধরে রাখে, সামনে নিয়ে চলে, থামতে দেয় না। অসাধারণ কথক তিনি, অসামান্য তাঁর কথকতা।

কিন্তু এই যে তাঁর কথকতা এর পেছনে রয়েছে যেমন গ্রন্থপাঠের জ্ঞান তেমনি বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতা। তাঁর কোনো লেখাই বক্তব্যহীন নয়; কেবল জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা কেন, রয়েছে বিচক্ষণতা, আছে জীবন ও জগৎ সম্পর্কে গভীর দার্শনিক উপলব্দি।

ছোট আকারের উপন্যাস *অবিশ্বাস্য*-এর কাহিনী যে অবিশ্বাস্য ঘটনা রয়েছে সেটা অবশ্যই বুঝি আমরা, কিন্তু পড়তে গিয়ে দেখি ওই অবিশ্বাস্যকে তিনি বিশ্বাসযোগ্য করে তুলেছেন তাঁর শিল্পদক্ষতার অনায়াস ব্যবহারে। সাহিত্য আসলে এই কাজটিই করে, সাধারণের ভেতর সে অসাধারণকে খুঁজে পায়, এবং অসাধারণের মধ্যে সাধারণকে। পূর্ববঙ্গের এক মহকুমা শহর মধুগঞ্জে এক বিদেশী দম্পতির জীবনে যে করুণ ঘটনা ঘটে গেছে তাকে আপাত-অবিশ্বাস্য বলা যাবে, কিন্তু এই দম্পতির জীবন ও পরিবেশকে যদি বিবেচনায় আনি তবে তা যে অসম্ভব এমন মনে হবে না। লেখক একটি পরিস্থিতি তৈরি করেছেন যেখানে অবিশ্বাস্যও বিশ্বাস্য হয়ে উঠেছে। আর ওইখানেই তাঁর শিল্পের বিশেষ পরীক্ষা, যে-পরীক্ষায় তিনি পুরোপুরি সফল।

কেবল ওই উপন্যাসে নয়, ভ্রমণ কাহিনী ও গল্প-কাহিনীতেও আপাত-অবিশ্বাস্য ঘটনা ও চরিত্রের সঙ্গে আমাদের বার বার, ঘন ঘন দেখা হয়। আমরা বিস্মিত হই, যেমন হই কৌতূহলী এবং তৃপ্ত হই পড়ে। অনুরণন থেকে যায় স্মৃতিতে। কেবল যদি ঘটনা থাকতো

তাহলে এমনটা ঘটতো না। ঘটনার সঙ্গে যে চরিত্রগুলো জড়িত তারাই বরঞ্চ প্রধান। মুজতবা আলী অসাধারণ কথক, তিনি গল্প বলায় অতুলনীয় ; তাঁর গল্পে পরিবেশ থাকে, জেগে ওঠে বিশেষ বিশেষ পরিস্থিতি। অতিঅল্প কথায়, যে কোনো শিল্পীর জন্য ঈর্ষণীয় সংযমে তিনি আমাদেরকে স্থাপন করেন তাঁর নিজের হাতে-তৈরি জগতটিতে। কিন্তু ওই জগতের কেন্দ্রে আছে চরিত্র। পরিবেশ, পরিস্থিতি, ভূগোল, ইতিহাস সমস্তকিছুই বিশেষ বিশেষ মানুষকে আমাদের সামনে নিয়ে আসে। এই মানুষগুলো না-থাকলে তাঁর শিল্প অমন সাফল্য অর্জন করতে পারতো কি না সন্দেহ।

তাঁর প্রথম ও সর্বাধিক পরিচিত বই *দেশে বিদেশে*, সেখানে একেবারে প্রথম বাক্য থেকেই নানা রকমের চরিত্রের আনাগোনা। প্রত্যেকটি চরিত্রই স্বতন্ত্র, এবং প্রত্যেকেই আকর্ষণীয়। হাওড়া স্টেশনের সহযাত্রী ফিরিঙ্গি, ট্রেনে পরিচয়-হওয়া সর্দারজী, কাবুলের আবদুর রহমান, কাউকেই সরানো যাবে না স্মৃতি থেকে। অবিশ্বাস্যের ডেভিড ও-রেলি ও তার স্ত্রীর মেবল-এর যে দুর্ভোগ তা ভুলবার নয়। *চাচা কাহিনীর* চাচা তো বটেই, জার্মান কর্নেল এবং পূর্ববঙ্গের এক গ্রামের স্কুলের পণ্ডিতমশাই কেউই উপেক্ষার পাত্র নন, মুজতবা আলীর বর্ণনার কারণে।

ভ্রমণ কাহিনী লিখে তিনি যে অমন ভাবে পাঠকদের চিত্ত হরণ করলেন তার একটা কারণ ওই কাহিনীতে ভ্রমণ আছে, রয়েছে চলমানতা, কোনো নির্দিষ্ট গন্তব্যে নয়, নানাদিকে। মুজতবা আলীর সকল রচনাতেই ভ্রমণ থাকে। তিনি নিজে চলমান, পাঠকদেরকেও নিয়ে চলেন সঙ্গে, এবং সেই যাত্রা তাতে অপ্রত্যাশিত অভাবিতপূর্ব নানা দৃশ্য ও ঘটনা থেকে এসে যায় আমাদের চোখের সামনে। আমরা আনন্দিত হই।

গুণের কথা উঠলে মুজতবা আলীর ভাষার কথা অবশ্যই আসবে। এ-ভাষাও একেবারে তাঁর নিজস্ব। চমক সৃষ্টির বিন্দুমাত্র চেষ্টা নেই, কিন্তু যেভাবে বাক্য ও শব্দ আসে তাতে মুহুর্মুহু চমকে উঠতে হয়। তাঁর বাকবৈদগ্ধ তুলনাবিরহিত। স্মরণ করা যাক। *দেশে বিদেশে* থেকে,

ক. সেদিন গল্পের প্লাবনে রৌদ্র আর গ্রীষ্ম দুই-ই ডুবে গিয়েছিল।
খ. গান্ধারী কান্দাহার থেকে এসেছিলেন। পাঠান মেয়ের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ দেখেই বোধ করি মহাভারতকার তাঁকে শতপুত্রবতী কল্পনা করেছিলেন।
গ. পুরাণের কতটা সত্যিকারের ইতিহাস আর কতটা ইতিহাসপাগলদের বোকা বানাবার জন্য পুরাণকারের নির্মম অট্টহাস্য তারই মীমাংসা করতে অর্ধেক জীবন কেটে যায়।

চাচা কাহিনীতে আছে

ক. ঠেলাঠেলির ভিতর বাসের হ্যাণ্ডেল ধরতে পেলে মানুষ যে রকম ঝুলে পড়ে, চাচা ঠিক তেমনি চাচার অবলম্বনের হ্যাণ্ডেল পেয়ে বললেন, 'উকিলের নাম বলুন চাচা, যে আপনাকে বাঁচালে।'
খ. লজ্জায় আমার কান লাল হয়ে গিয়েছিল, না ভয়ে আমার মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গিয়েছিল, না আশ্চর্য হয়ে আমার চুল খাড়া হয়ে গিয়েছিল আজ এক দিন বাদে বলতে পারব না।

গ. তেতার চেয়ার ছেড়ে ওঠা আর চলে যাওয়ার ধরন দেখে মনে হল যেন টিন ছেড়ে রজনীগন্ধাটি দু'খানা পা বের করে ঘরের ভিতর দিয়ে হেঁটে চলে গেল।
ঘ. ভোজের শেষে সন্দেশ-মিষ্টি না দিলে বরযাত্রীদের যে রকম হন্যে হয়ে ওঠার কথা আমরা ঠিক সেই রকম এক সঙ্গে চেঁচিয়ে উঠলুম।
ঙ. যেদিকে তাকাই সেদিকেই হেডমাস্টার— নিশ্চয়ই তাঁর অনেকগুলো যমজভাই আছেন, আর ইস্কুল সামলানোর জন্য সেদিন সব ক'জনকে রিকুইজিশন করে নিয়ে এসেছেন।

অবিশ্বাস্যতে পড়ি–

তারপর জ্যৈষ্ঠ আষাঢ়ের খরদাহের পর নামল বর্ষা। কলকাতার বদখদ দালানকোঠার উপর বর্ষা যখন নামে তখন বড়বাজারের মেরদিক মাড়োয়ারী পর্যন্ত আকাশের দিকে দুএকবার না তাকিয়ে থাকতে পারে না, আর কলেজের মেয়েরা নাকি ছাদের উপর বৃষ্টির জলে ভেজবার অছিলা করে মেঘের জলের সঙ্গে চোখের জল মেশায়। আর তাতে আশ্চর্য হবারই বা কী আছে! ছেলেরা তো কলেজ পাসের পর অন্ধকার ভবিষ্যতের কথা ভেবে প্রেম, বিয়ে-শাদি মন থেকে কুলোর বাতাস দিয়ে খেদিয়ে দেয়। মেয়েরা শুধু অজানা ভবিষ্যতকে ডরায় না বলে যে-একেবারে প্রেমে পড়ে আর তারই প্রকাশ খুঁজতে গিয়ে রবিঠাকুরের গান আর কবিতা বাঁচিয়ে রাখে।

মুজতবা আলী নানা দেশে গেছেন, কেবল প্রকৃতি দেখেন নি, মানুষই দেখেছে বরঞ্চ বেশি করে, মানুষকে মিলিয়ে দেখেছেন প্রকৃতি ও সংস্কৃতির সঙ্গে; তাঁর শিক্ষাজীবনের একাংশ কেটেছে জার্মানীতে, আরেক অংশ কায়রোতে। অনেক ক'টি ভাষা জানতেন, সেই জ্ঞানকে ব্যবহারও করেছেন তাঁর নিজের লেখায়, কিন্তু সর্বদাই এবং অসংশোধনীয় রূপে তিনি বাঙালী, কেবল বাঙালী নয় পূর্ববঙ্গের বাঙাল। বাংলায় লেখেন, এবং বাঙালীত্ব নিয়ে গর্ব করেন। মাতৃভাষার প্রতি এই অনড় আনুগত্য তাঁর সব রচনাতেই প্রকাশ পেয়েছে, উজ্জ্বল ভাবে উপস্থিত রয়েছে রচনাবলীর এই বর্তমান খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত *পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা* নামের ছোট বইটিতে।

এটি একটি বক্তৃতার লিখিত ভাষ্য, যে-বক্তৃতাটি তিনি দেশ বিভাগের পরপরেই ১৯৪৭ সালের ৩০শে নভেম্বর সিলেটের মুসলিম সাহিত্য সংসদের এক সভায় দিয়েছিলেন। মুজতবা আলীর মূল বক্তব্য হচ্ছে মাতৃভাষার ব্যবহার। তিনি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন যে, শিক্ষার বাহন হবে বাংলা অর্থাৎ পূর্ব পাকিস্তানবাসীর মাতৃভাষা। তাঁর জিজ্ঞাসা, "প্রথমত পৃথিবীর কোন শিক্ষিত সভ্য দেশ মাতৃভাষা ছাড়া অন্য মাধ্যমে শিক্ষা দিচ্ছে। ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জার্মানী, ইতালি, চীন জাপান, রুশ, মিশর, ইরাক, তুর্কী, ইরান এমন কোন দেশ আছে সেখানকার লোক আপন মাতৃভাষাকে অবমাননা করে আপন দেশ থেকে বিতাড়িত করেছে ?" মাতৃভাষা ভিন্ন অন্য মাধ্যমে শিক্ষাদানের চেষ্টা যেসব দেশে করা হয়েছে তার ফল যে অত্যন্ত ক্ষতিকর হয়েছে তার দৃষ্টান্ত দিয়ে মুজতবা আলী বলছেন, "এসব উদাহরণ থেকে এইটুকু স্পষ্ট বোঝা যায় যে, যতদিন পর্যন্ত মাতৃভাষাকে শিক্ষার মাধ্যমিক রূপে গ্রহণ না করা হয় ততদিন শিক্ষা সমাজের উচ্চস্তরের গুটিকয়েক মানুষের

সংস্কৃতিবিলাসের উপকরণ হয় মাত্র এবং যেখানে পূর্বে শুধু অর্থের পার্থক্য মানুষে মানুষে বিভেদ আনত সেখানে 'উচ্চশিক্ষা' ও সংস্কৃতির পার্থক্য দুই শ্রেণীর বিরোধ কঠোরতর করে তোলে।" ভাষা যে কত শক্তিশালী মুজতবা আলী তা দৃষ্টান্তসহ দেখিয়েছেন, ইতিহাস থেকে উল্লেখ করেছেন বাস্তব ঘটনার যেখানে দেখা যাচ্ছে মানুষ ধর্মান্তরিত হয়েছে বটে, কিন্তু ভাষান্তরিত হয় নি।

মুজতবা আলী যখন এই বক্তব্য উপস্থিত করছিলেন সদ্যপ্রতিষ্ঠিত পাকিস্তানে তখন দ্বিজাতিতত্ত্বের প্রবল দাপট চলছে। মুসলিম সাহিত্য সংসদের ওই সভায় কিছুলোক তাঁর বক্তৃতার সময় গোলযোগ সৃষ্টির চেষ্টা করছিল। এটাও লক্ষ্য করবার বিষয় যে, মুজতবা আলী সারা পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষার বিষয়ে বলছিলেন না, তাঁর বক্তব্যের বিষয় ছিল পূর্ব-পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা সম্পর্কে। বাংলাভাষাকেও পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবী তখনও ঢাকাতেই ওঠে নি, মফস্বলে তো উঠবার কথাই নয়। কিন্তু মুজতবা আলী ১৯৪৭ সালেই যে ভবিষ্যতবাণী উচ্চারণ করেছিলেন পরে একাত্তরে এসে তা প্রায় অক্ষরে অক্ষরে সত্য প্রমাণিত হয়েছে। তিনি বলেছিলেন, "পূর্ব পাকিস্তানের অনিচ্ছা সত্ত্বেও যদি তার ঘাড়ে উর্দু চাপানো হয় তবে স্বভাবতই উর্দু-ভাষাভাষী বহু নিষ্কর্মা শুধু ভাষার জোরে পূর্ব পাকিস্তানকে শোষন করার চেষ্টা করবে। ... এবং ফলে জনসাধারণ একদিন বিদ্রোহ করে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে।" বাস্তবে তা-ই ঘটেছে, পার্থক্য শুধু এইটুকু যে পূর্ববঙ্গ বিচ্ছিন্ন হয় নি, স্বাধীন হয়েছে।

পাকিস্তান রাষ্ট্রের শাসক শ্রেণী পূর্ববঙ্গের উপর উর্দুভাষা চাপাতে চেয়েছিল, কিন্তু ব্যাপারটা যে কেবল ভাষা চাপানোর ব্যাপার ছিল না, ছিল আসলে শোষণের তৎপরতা মুজতবা আলী সেটা স্পষ্ট দেখতে পেয়েছিলেন। পাকিস্তান তখন নতুন হয়েছে, তার মধ্যেই তিনি পূর্ববঙ্গ যে একদিন বিদ্রোহ করতে পারে সে-সম্ভাবনা দেখতে পেয়েছেন। বোঝা যায় কত গভীর ছিল তাঁর অন্তর্দৃষ্টি। আরো একটি উপলব্ধি তাঁর ছিল, তিনি মনে করতেন পাকিস্তানের হওয়া উচিৎ একটি সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র। কেবল পাকিস্তানের নয়, সেই সঙ্গে ভারতেরও। পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা বিষয়ে বলতে গিয়ে একবারে শুরুর দিকেই তিনি তাঁর উপলব্ধির কথা জানিয়েছেন। বলেছেন, "পাকিস্তান বড়লোকের জন্য নয়, গরীবের হক পাকিস্তানে বেশী।" উপসংহারে এসে মন্তব্য করছেন, পাকিস্তান ও ভারত "উভয় রাষ্ট্র সমাজতন্ত্রের ভিত্তিতে হোক, এই আমাদের প্রধান কাম্য।"

সৈয়দ মুজতবা আলীর রচনাবলী একথাটা এক বাক্যেও জোর দিয়ে বলে যে, তিনি সদাসর্বদাই একজন বাঙালী। অনুসন্ধান করলে এটাও ধরা পড়বে যে তাঁর পক্ষপাত ছিল সমাজতন্ত্রের দিকেই। সে-জন্য তখনকার পূর্ব পাকিস্তানে তিনি থাকতে পারেন নি, ১৯৪৮-এ তিনি বগুড়া কলেজে অধ্যক্ষ হিসাবে যোগ দিয়েছিলেন কিন্তু টিকতে পারলেন না, অচিরেই তাঁকে দেশ ত্যাগ করতে হলো। কিন্তু যেখানেই থাকুন তিনি আমাদেরই লোক। তখনও ছিলেন, এখনও আছেন ; এবং সবসময়ে থাকবেন।

স্টুডেন্ট ওয়েজ'কে অভিনন্দন তাঁরা সৈয়দ মুজতবা আলীর রচনাবলী এক সঙ্গে পাঠকদের কাছে পৌছে দেওয়ার আয়োজন করেছেন। এতে পাঠকের বড়ই উপকার হবে।

পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা

পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা যে শেষ পর্যন্ত বাংলা ভাষাই হবে সে সম্বন্ধে আমাদের মনে কখনো কোনো সন্দেহ ছিল না এবং একথাও নিঃসন্দেহে জানি যে যদিও এখনকার মত বাংলার দাবী মেনে নেওয়া হয়েছে তবু উর্দুওয়ালারা আবার সুযোগ পেলেই মাথা খাড়া করে উঠতে পারেন। আমরা যে এতদিন এ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করি নি তার প্রধান কারণ বাংলা-উর্দু-দ্বন্দ্ব রাজনৈতিক রঙ ধরে নিয়ে দলাদলির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল; সে অবস্থায় সুস্থ মনে, শান্ত-চিত্তে বিচার করার প্রবৃত্তি কোনো পক্ষেরই ছিল না। আবহাওয়া এখন ফের অনেকটা শান্ত হয়ে এসেছে; এইবেলা উভয় পক্ষের যুক্তিগুলো ভালো করে তলিয়ে দেখে নিলে ভবিষ্যতের অনেক তিক্ততা এবং অর্থহীন দ্বন্দ্ব থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যাবে।

উর্দুওয়ালাদের প্রথম ও প্রধান যুক্তি এই : পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তান অভিন্ন রাষ্ট্র। সেই রাষ্ট্রের কেন্দ্রে যে-ভাষা প্রচলিত পূর্ব পাকিস্তানে যদি সে ভাষা প্রচলিত না থাকে তবে রাজনৈতিক ও কৃষ্টিগত সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে।

উত্তরে আমরা বলি, পূর্ব পাকিস্তানের আপামর জনসাধারণকে বাংলা ভুলিয়ে উর্দু শিখিয়ে যদি কেন্দ্রের সঙ্গে এক করে দেওয়া সম্ভবপর হত তা হলে যে এ বন্দোবস্ত উত্তম হত তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু প্রশ্ন, এ কাজ কি সোজা ? উত্তরে আমরা বলি একাজ অসম্ভব।

কেন অসম্ভব এ প্রশ্ন যদি শোধান তবে তার উত্তর দু'রকমের হতে পারে। প্রথম রকমের উত্তর দেওয়া যায় ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত দিয়ে। আমরা যদি একথা সপ্রমাণ করতে পারি যে পৃথিবীর ইতিহাসে কস্মিনকালেও এহেন কাণ্ড ঘটে নি এবং যতবার চেষ্টা করা হয়েছে ততবারই সে চেষ্টা নিষ্ফল হয়েছে তবে হয়তো অনেকেই স্বীকার করে নেবেন যে, অসম্ভব কর্ম সমাধান করার চেষ্টা করে মূর্খ, বলদকে দোয়াবার চেষ্টা সেই করে যার বুদ্ধি বলদেরই ন্যায়।

ইয়োরোপ আমেরিকা থেকে উদাহরণ দেব না। উর্দুওয়ালারা এসব জায়গার উদাহরণ মেনে নিতে স্বভাবতই গড়িমসি করবেন। তাই উদাহরণ নেব এমন সব দেশ থেকে যে সব দেশকে সাধারণত 'পাক' অর্থাৎ 'পবিত্র' অর্থাৎ ইসলামী বলে স্বীকার করে নেওয়া হয়। এসব দেশের ইতিহাস ও বর্তমান পরিস্থিতি উর্দুওয়ালাদের জানার কথা, না জানলে জানা উচিত।

আরব ও ইরানের (পারস্যের) মানচিত্রের দিকে তাকালেই দেখতে পাবেন যে এ দু'দেশের মাঝখানে কোনো তৃতীয় দেশ নেই। অর্থাৎ আরবদেশের পূর্ব সীমান্তে যেখানে আরবী ভাষা এসে শেষ হয়েছে ঠিক সেখান থেকেই ফার্সী ভাষা আরম্ভ হয়েছে। উত্তর পশ্চিম সীমান্তে ও যেখানে আরবী ভাষা শেষ হয়েছে সেখান থেকেই তুর্কী ভাষা আরম্ভ হয়েছে।

সকলেই জানেন খলিফা আবু বকরের আমলে মুসলিম আরবেরা অমুসলিম ইরান দখল করে। ফলে সমস্ত ইরানের লোক আগুন-পূজা ছেড়ে দিয়ে মুসলিম হয়। মুসলিম শিক্ষাদীক্ষা মুসলিম রাজনৈতিক অনুপ্রেরণার কেন্দ্রভূমি তখন মদীনা। কেন্দ্রের ভাষা আরবী

এবং যে ভাষাতে কুরান নাজিল অর্থাৎ অবতীর্ণ হয়েছেন, হজরতের বাণী হাদীসরূপে সেই ভাষায়ই পরিস্ফুট হয়েছে। কাজেই আমরা অনায়াসে ধরে নিতে পারি যে কেন্দ্রের সঙ্গে যোগসূত্র দৃঢ় করার বাসনায় ইরানে আরবী ভাষা প্রবর্তিত করার ব্যাপক চেষ্টা করা হয়েছিল। আমরা জানি বহু ইরানবাসী ইসলাম গ্রহণ করে, আরবী শিখে, মুসলিম জগতে নাম রেখে গিয়েছেন। আরো জানি পরবর্তী যুগে অর্থাৎ আব্বাসীদের আমলে আরবী রাষ্ট্রকেন্দ্র ইরানের আরো কাছে চলে এসেছিল। ইরাকের বাগদাদ ইরানের অত্যন্ত কাছে ও আব্বাসী যুগে বহু ইরানী বাগদাদে বসবাস করে উচ্চাঙ্গের আরবী শিখতে সমর্থ হয়েছিলেন। সমস্ত ইরানদেশে তখন আরব গবর্ণর, রাজকর্মচারী, ব্যবসাদার, পাইকবরকন্দাজে ভর্তি হয়ে গিয়েছিল। ইরানের সর্বত্র তখন আরবী মক্তব-মাদ্রাসার ছড়াছড়ি, আরবী-শিক্ষিত মৌলবী-মৌলানায় ইরান তখন গমগম করত।

তবে কেন তিনশত বৎসর যেতে না যেতে ফার্সীভাষা মাথা খাড়া করে উঠল? দশম শতাব্দীর শেষভাগে দেখতে পাই, ফার্সীভাষার নবজাগরণের চাঞ্চল্য সমস্ত ইরানভূমিকে ক্ষুব্ধ করে তুলেছে। গল্প শুনি, ফিরদৌসীকে নাকি ফরমাইশ দেওয়া হয়েছিল ইরানের প্রাকমুসলিম সভ্যতার প্রশস্তি গেয়ে যেন কাব্য রচনা করা হয়, এবং ততোধিক গুরুত্বব্যঞ্জক (মুহিম) ফরমাইশ, সে কাব্য যেন দেশজ ফার্সী কথায় রচিত হয়, তাতে যেন আরবী শব্দ বিলকুল ঢুকতে না পারে। গল্পটি কতদূর সত্য বলা কঠিন। কারণ ফিরদৌসীর মহাকাব্যে অনেক আরবী কথা আছে কিন্তু এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে আরবী ভাষা যে-কোনো কারণেই হোক দেশের আপামর জনসাধারণকে তৃপ্ত করতে পারে নি বলেই ফার্সীর অভ্যুত্থান হল।

তারপর একদিন ফার্সী ইরানের রাষ্ট্রভাষা হয়ে গেল।

উর্দুওয়ালারা হয়তো উত্তরে বলবেন যে ইরান শীয়া হয়ে গেল বলেই সুন্নী আরবের সঙ্গে কলহ করে ফার্সী চালাল। এ-উত্তরে আছে লোক ঠকানোর মতলব। কারণ ঐতিহাসিক মাত্রই জানেন ফিরদৌসীর পৃষ্ঠপোষক ছিলেন গজনীর সুলতান মাহমুদ এবং তিনি ছিলেন এতই কট্টর সুন্নী যে তিনি সিন্ধুদেশের হাজার হাজার করামিতাকে (ইসমাইলী শীয়া) কতল-ই-আমে অর্থাৎ পাইকারী হননে-ফীনারিজহান্নম বা পরলোকে পাঠিয়েছিলেন। কাজেই বোঝা গেল যে এই আরবীবিরোধী ফার্সী আন্দোলনের পশ্চাতে শীয়া-সুন্নী দুই সম্প্রদায়ই ছিলেন।

না হয় ইরান শীয়াই হয়ে গিয়েছিল কিন্তু তুর্কীর বেলা কি? তুর্কীর আপামর জনসাধারণ সুন্নী এবং শুধু যে সুন্নী তাই নয় হানিফী সুন্নীও বটে। ইরানেরই মত একদিন তুর্কীতেও আরবী চালাবার চেষ্টা করা হয়েছিল কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে-চেষ্টা সফল হয় নি। শেষ পর্যন্ত তুর্কী-ভাষাই তুর্কের রাষ্ট্রভাষা হল। উর্দুওয়ালাদের স্মরণ থাকতে পারে যে কয়েক বৎসর পূর্বে তুর্কী ও ইরান উভয় দেশে জোর জাতীয়তাবাদের ফলে চেষ্টা হয় তুর্কী ও ফার্সী থেকে বেবাক আরবী শব্দ তাড়িয়ে দেওয়ার। আমরা এ ধরনের উগ্রচণ্ডা জাতীয়তাবাদ ও ভাষা 'বিতদ্ধিকরণ' বাইয়ের পক্ষপাতী নই; তবুও যে ঘটনাটির কথা উর্দুওয়ালাদের স্মরণ করিয়ে দিলুম তার একমাত্র কারণ, কেন্দ্রের সঙ্গে যোগসূত্র যতই মূল্যবান হোক না কেন তার জন্য মানুষ সব সময় সব কিছু বিসর্জন দিতে রাজী হয় না। (এস্থলে ঈষৎ অবান্তর হলেও একটি কথা বলে রাখা ভালো—পাছে উর্দুওয়ালারা আমাদের নীতি ঠিক বুঝতে না পারেন—আমরা ভাষা 'শুদ্ধিকরণে' বিশ্বাস করি না বলেই বাংলা

থেকে সংস্কৃত শব্দ তাড়াতে চাইনে। তা হলে সেই পাগলামীর পুনরাবৃত্তি করা হবে মাত্র; আজকের দিনে কে না বুঝতে পারে ফোর্ট উইলিয়ামি পণ্ডিতরা বাংলা থেকে আরবী ফার্সী শব্দ বর্জন করে কি আহাম্মুখিই না করেছিলেন।)

উর্দুওয়ালারা হয়তো প্রশ্ন শুধাবেন, তা হলে মিশরে আরবী চলল কি করে? মুসলমান বিজয়ের পূর্বে মিশরের ভাষা তো আরবী ছিল না। তার উত্তর এই যে মিশর জয়ের পর লক্ষ লক্ষ আরব মিশরে বসবাস আরম্ভ করে ও কালক্রমে দেশের আদিম অধিবাসী ও বিদেশীতে মিলে গিয়ে যে ভাষা গড়ে ওঠে তারি নাম মিশরী আরবী। সংমিশ্রণ একটি কথা দিয়েই সপ্রমাণ করা যায়; যদিও আরবীতে 'জিম' হরফের উচ্চারণ বাংলার 'জ'-এর মত, তবু মিশরীরা উচ্চারণ করে 'গ'য়ের মত। 'জবল'কে বলে 'গবল', 'নজীব'কে বলে 'নগীব', অল্পশিক্ষিত লোক 'ইজা জা' নস্'র উল্লা' না বলে বলে 'ইজাগা'—ইত্যাদি। অন্য দিক দিয়ে মিশরী ফল্লাহিন (চাষা) ও আরবী বেদুইনের মধ্যে দেহের গঠন, চামড়ার রঙ ইত্যাদিতে বিশেষ কোনো পার্থক্য নেই।

এতগুলো উদাহরণ দেবার পরও যদি কেউ সন্তুষ্ট না হন তবে তার সামনে একটি ঘরোয়া উদাহরণ পেশ করি। পাঠান মোগল (এমনকি ইংরেজ রাজত্বের প্রথম দিকে) যুগে এদেশে শুধু কেন্দ্রে নয়, সবগুলোতে পর্যন্ত ফার্সী ছিল রাষ্ট্র ভাষা। তবু কেন সে ভাষা দেশজ হিন্দী বাংলা প্রভৃতি ভাষাকে মেরে ফেলে নিজে অজরামর হয়ে কায়েমি খুঁটি গাড়তে পারল না? উর্দুওয়ালারা হয়তো বলবেন, 'ইংরেজ ফার্সী উচ্ছেদ করে দিল তাই'।

কিন্তু সে উচ্ছেদের ব্যবস্থা তো পাঠান-মোগলরাই করে গিয়েছিলেন। পাঠান আমলের বিখ্যাত কবি আমির খুসরৌ ফার্সীতে উচ্চাঙ্গের কাব্য রচনা করে গিয়েছিলেন অথচ দূরদৃষ্টি ছিল বলে তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে শেষ পর্যন্ত ফার্সী এদেশে চলবে না, দেশজ ভাষা পুনরায় আপন আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত হবে। এ তত্ত্বটা ভালো করে বুঝতে পেরেছিলেন বলেই তিনি ফার্সী ও তখনকার দেশজ ভাষা হিন্দী মিশিয়ে কবিতা রচনার এক্সপেরিমেন্ট করে গিয়েছিলেন। নিচের উদাহরণটি উর্দুওয়ালাদের জানবার কথা :

"হিন্দুবাচ্চেরা বৃ নিগর্ আজব হুস্ন ধরত হৈ।
দর্ ওয়ক্তে সুখন গুফ্তন্ মুহ্ ফুল ঝরত হৈ।।
গুফ্তম বিয়া কে বর্ লবেতো বোসে বাগীরম্
গুফ্ৎ আরে রাম ধরম নষ্ট করত হৈ।।"

হিন্দু তরুণ কি অপূর্ব সৌন্দর্যই না ধারণ করে। যখন কথা বলে তখন মুখ হতে ফুল ঝরে— বললুম, আয় তোর ঠোঁটে একটি চুমো খাব—বললে, আরে রাম! ধর্ম নষ্ট করত হায়—

এই এক্সপেরিমেন্টের ফলেই দেখতে পাই শাহজাহানের আমলে উর্দু ভাষা সৃষ্টি হয়েছে ও অষ্টাদশ-উনবিংশ শতাব্দীতে দেখতে পাই ফার্সী আস্তে আস্তে হটে গিয়ে উর্দুর জন্য জায়গা করে দিচ্ছেন। আজকের দিনে পরিস্থিতিটা কি? ফার্সীর লীলাভূমি দিল্লী লক্ষ্ণৌয়ে এখন সাহিত্য সৃষ্ট হয় উর্দু ভাষাতে, ফার্সী সেখানে আরবী এবং সংস্কৃতের মত 'মৃত ভাষা' বা 'ডেড ল্যাংগুইজ'।

হয়তো উর্দুওয়ালারা বলবেন, উর্দুতে প্রচুর আরবী, ফার্সী শব্দ থাকায় তিনি পদে উঠে গেছেন। এর উত্তর বলি, ফার্সী যে রকম বিস্তর আরবী শব্দ গ্রহণ করেও ফার্সীই থেকে গিয়েছে উর্দুও সেই রকম বিস্তর আরবী ফার্সী শব্দ গ্রহণ করা সত্ত্বেও উর্দুই থেকে গিয়েছে, সে এই দেশের দেশজ ভাষা। বিদেশী শব্দের প্রাধান্য অপ্রাচুর্য নিয়ে ভাষার বর্ণ, গোত্রের বিচার হয় না। পূর্ববঙ্গের আলিম-ফাজিলগণ যখন অকাতরে আরবী ফার্সী শব্দ প্রয়োগ করে বাংলায় 'ওয়াজ' বা 'পাবলিক লেকচর' দেন তখন সে ভাষা আরবী, ফার্সী বা উর্দু নামে পরিচিত হয় না, সে ভাষা বাংলাই থেকে যায়।

ঘোড়াটি আমার ভালোবাসিত গো শুনিতে আমার গান
এখন হইতে সে ঘোড়াশালেতে বাঁধা রবে দিনমান।
জিনি তরঙ্গ সুন্দরী মোর তাতার বাসিনী সাকী
লীলাচঞ্চলা রঙ্গ নিপুণা শিবিরে এসেছি রাখি।
ঘোড়ার আমার জুটিবে সোয়ার ইয়ার পাইবে সাকী
শুধু মা আমার এ বুড়া বয়সে কাঁদিয়া মুদিবে আঁখি।

—সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

শব্দের প্রাচুর্য অপ্রাচুর্য ভেদে যদি ভাষার বংশ বিচার করতে হয় তা হলে বলতে হবে এই কবিতার চতুর্থ ছত্র সংস্কৃত, পঞ্চম ছত্র আরবী-ফার্সী ও গোটা কবিতাটা খোদায় মালুম কি। কিন্তু উপস্থিত এ আলোচনা মুলতুবি থাক—উর্দু কি হিসাবে 'পাক' ও বাংলা 'না-পাক' সে আলোচনা পরে হবে।

এ প্রসঙ্গে উর্দুওয়ালাদের কাছে আমাদের শেষ প্রশ্ন; ত্রয়োদশ শতকে মুসলমান কর্তৃক বঙ্গবিজয় থেকে আরম্ভ করে উনবিংশ শতকের প্রায় মধ্যভাগ পর্যন্ত ফার্সী উর্দু এদেশে চালু ছিল। শাহজাহানের আমল থেকে আজ পর্যন্ত বেশুমার মৌলবী-মৌলানা, আলিম-ফাজিল দেওবন্দ রামপুর থেকে উর্দু শিখে এসে এদেশে উর্দুতে ওয়াজ ঝেড়েছেন, উর্দুতে 'গুফ্‌তগু' করেছেন; মনে পড়েছে ছেলেবেলায় দেখেছি উদ্ধত অর্বাচীন তরুণ যখনই তর্কে মোল্লাদের কাবু করেছে তখনই তাঁরা হঠাৎ উর্দুতে কথা বলতে আরম্ভ করে (আজ জানি সে উর্দু কত নক্কারজনক ভুলে পরিপূর্ণ থাকত) আপন যুক্তির অভাব অথবা দুর্বলতা ঢাকবার চেষ্টা করেছেন এবং চাষাভূষার কাছে মুখ বাঁচিয়েছেন। সে কথা থাক, কারণ এমন মৌলবী-মৌলানার সংস্পর্শেও এসেছি যাঁদের সঙ্গে তর্কে হেরেও আনন্দ পেয়েছি, কিন্তু আসল প্রশ্ন এইসব আলিম-ফাজিলগণ বাংলাদেশের শিক্ষা ও কৃষ্টি নির্মাণের সম্পূর্ণ ভার হাতে পেয়েও শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে চেষ্টা করা সত্ত্বেও এদেশের আপামর জনসাধারণকে 'নাপাক' বাংলা ভুলিয়ে ফার্সী বা উর্দু চালাতে সক্ষম হলেন না কেন? ইংরেজী স্কুল তখন ছিল না, সংস্কৃত টোল তখন অনাদৃত, আরবী-ফার্সী-উর্দু শিখলে তখন উম্‌দা উম্‌দা নোকরি মিলত, বাদশাহ-সুবাদারের মজলিসে শিরোপা মিলত, মনসব মিলত আর আরবী ফার্সীর জরিয়ায় বেহেস্তের দ্বার তো খুলতই। ইহলোক পরলোক উভয় লোকের প্রলোভন সত্ত্বেও বাঙালী মুসলমান ন্যাপাক বাংলায় কেন কথাবার্তা বলল, জারীমর্সিয়া রচনা করল, ভাটিয়ালি-পীরমুর্শিদী, আউল বাউল, সাঁইদরবেশী গান গাইল, কেচ্ছা-সাহিত্য তৈরী করল, রাধার চোখের পানি নিয়ে 'বিদাত' কবিতা লিখল? এবং

একথাও তো জানি যে মৌলবী-মৌলানারা এসব লেখা-সাহিত্যের প্রতি উদাসীন ছিলেন না, তাঁরা বারবার ফতোয়া দিয়েছেন যে এসব সাহিত্য 'বিদাত', 'নাজাইজ', 'কুফর' 'শিরক্'। তৎসত্ত্বেও এগুলো এখনো খেয়াঘাটে, বাথানে, চাষার বাড়িতে পড়া হয়, এসব বই এখনো ছাপা হয়, হাটবারে বটতলায় বিক্রয় হয়।

শুধু তাই? পাঠান বাদশাহরা পয়সা খরচ করে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের দিয়ে মহাভারত, রামায়ণ বাংলায় অনুবাদ করালেন। বাদশাহদের দরবারে বিস্তর আলিম-ফাজিল ছিলেন। তাঁরা তখন নিশ্চয়ই এই 'ফজুল', 'বিদাত', 'ওয়াহিয়াত', 'ইসরাফের' বিরুদ্ধে তারস্বরে প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন কিন্তু শেষ পর্যন্ত তো তত্ত্বকথা এই যে আজ পর্যন্ত এদেশে পরাগল খান, ছুটি খানের নাম রয়ে গিয়েছে বাংলা ভাষার পৃষ্ঠপোষক হিসাবে।

কিন্তু আমাদের আসল প্রশ্নটা যেন ধামাচাপা পড়ে না যায়। উর্দুওয়ালাদের কাছে আমার সবিনয় প্রশ্ন: বাংলাদেশের কৃষ্টিজগতে প্রায় ছয় শত বৎসর একাধিপত্য করেও তাঁরা যখন উর্দু চালাতে পারেন নি তখন বর্তমান যুগের নানা কৃষ্টিগত দ্বন্দ্ব বহু নিদারুণ দারিদ্র্য, ক্রমবর্ধমান বাংলাসাহিত্য ও ভাষার সঙ্গে বিজড়িত মুসলমান-হিন্দুকে তাদের মাতৃভাষা ভুলিয়ে উর্দু চালানো কি সম্ভবপর?

আরব ইরান পাশাপাশি দেশ, এক দেশ থেকে আরেক দেশ গমনাগমনে কোনো অসুবিধা ছিল না, উর্দুর তুলনায় আরবী বহু পূতপবিত্র ভাষা ও সে ভাষা ইসলামের তাবৎ দৌলত ধারণ করে; তৎসত্ত্বেও যখন ইরানে আরবী চলল না তখন যে পূর্ব পাকিস্তান থেকে পশ্চিম পাকিস্তান বহু শত ক্রোশ দূরে—মাঝখানে আবার এমন রাষ্ট্র যার সঙ্গে এখনো পুরা সমঝাওতা হয় নি—যে পশ্চিম পাকিস্তানেও আবার পাঁচটি ভিন্ন ভিন্ন ভাষা প্রচলিত সেই পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান একজোট হবেই বা কি করে আর একে অন্যকে উর্দু শিখাবেই বা কি প্রকারে? এ তো দু'পাঁচজন মাস্টারের কথা নয়, আমাদের দরকার হবে হাজার হাজার লোকের। আর হাজার হাজার নবাগতকে পোষবার ক্ষমতা যদি পূর্ব পাকিস্তানের থাকবেই তবে পূর্ব পাঞ্জাব থেকে বিতাড়িত হতভাগ্য মুসলমানদের কি পূর্ব পাকিস্তান একদিনে আমন্ত্রণ করে চোখের জল মুছিয়ে দিত না, মুখে অন্ন তুলে ধরত না?

হয়তো উর্দুওয়ালারা বলবেন যে, সমস্ত দেশকে উর্দু শেখানো তাঁদের মতলব নয়; তাঁদের মতলব প্রাইমারী স্কুলে অর্থাৎ গ্রাম্য পাঠশালায় বাংলা শেখানো এবং হাইস্কুল ও কলেজ-য়ুনিভার্সিটিতে উর্দু চালানো।

তাই যদি হয় তবে ফল হবে এই যে হাইস্কুল-কলেজে উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত গুণী-জ্ঞানীরা কেতাব লিখবেন উর্দুতে। তাতে ইসলামের প্রাচীন ইতিহাস থাকবে, সে ঐতিহ্যের সঙ্গে কাঁধ মিলিয়ে পাকিস্তানের নবীন রাষ্ট্র কি করে গড়ে তুলতে হবে তার কায়দাকানুনের বয়ান থাকবে, আল্লা রসুলের বাণী সেসব কেতাবে নূতন করে প্রচারিত হবে এবং এ-সব তাবৎ দৌলতের ভোগী হবেন উর্দু জাননেওয়ালারা। অথচ পূর্ব পাকিস্তানের শতকরা ৮০/৯০ জন চাষা-মজুর; তাদের শিক্ষা সমাপ্তি যে পাঠশালা পাশের সঙ্গে সঙ্গেই হয়ে যাবে সে কথাও নিশ্চয় জানি এবং তারা এ সব কেতাব পড়তে পারবে না। এই শতকরা আশিজনের উপর যে নবীন রাষ্ট্র নির্মিত হবে তার আদর্শ নূতন, আকাঙ্ক্ষা নূতন এবং সে আদর্শ পৌঁছানোর জন্য যেসব বয়ান উর্দুভাষাতে লেখা হবে তারা সেসব পড়তে সক্ষম হবে না। অর্থাৎ শতকরা আশিজন কোনো কিছু না জেনেশুনে আদর্শ রাষ্ট্র গড়াতে উঠে পড়ে লেগে যাবে।

এ বড় মারাত্মক ব্যবস্থা, এ বড় অনৈসলামিক কুব্যবস্থা। প্রাচীন ঐতিহ্যপন্থী মৌলবী-মৌলানাকে যত দোষ দিতে চান দিন, কিন্তু এ-দোষ তাঁদের জানী দুশমনও দিতে পারবেন না যে তাঁরা ধনী এবং গরীবের জন্য পৃথক পৃথক শিক্ষা ব্যবস্থা করেছিলেন। ধনীর ছেলেকে তারা যেমন আরবী-ফারসী-উর্দু শিখিয়েছিলেন, গরীবের ছেলেকেও ঠিক সেই কারিকুলামের ভেতর দিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। যদি পাকচক্রে পূর্ব পাকিস্তানকে কোনো দিন উর্দু গ্রহণ করতেই হয় এবং স্বীকার করে নিতেও হয় যে আমাদের সাহিত্য এবং অন্যান্য সৃষ্টি উর্দুতেই হবে, তবে তাঁরা পাঠশালায়ও উর্দু চালাবেন। দেবভাষা ও গণভাষা বলে পৃথক পৃথক বস্তু স্বীকার করা ইসলাম ঐতিহ্য পরিপন্থী।

পাকিস্তান বড়লোকের জন্য নয়, গরীবের হক পাকিস্তানে বেশী।

ইংরেজও 'ভদ্রলোক' ও 'ছোটলোকে'র ভিন্ন ভিন্ন শিক্ষাব্যবস্থা করে এক অদ্ভুত পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছিল। ইংরেজ কৃষি রিপোর্ট বের করত ইংরেজি ভাষায় এবং চাষাভূষাদের শেখাত বাংলা! বোধ হয় ভাবত বাঙালি 'মাছিমারা' কেরানী যখন ইংরেজি না জেনেও ইংরেজি দলিলপত্র নকল করতে পারে তখন ইংরেজি অনভিজ্ঞ চাষাই বা ইংরেজিতে লেখা কৃষি রিপোর্ট, আবহাওয়ার খবরাখবর পড়তে পারবে না কেন? এই পাগলামি নিয়ে যে আমরা কত ঠাট্টা-মস্করা করেছি সেকথা হয়তো উর্দুওয়ালারা ভুলে গিয়েছেন কিন্তু আমরা ভুলি নি। তাই শুধাই, এবার কি আমাদের পালা? এখন আমরা কৃষি-রিপোর্ট, বাজার দর, আবহাওয়ার খবরাখবর বের করব উর্দুতে আর চাষীদের শেখাব বাংলা! খবর শুনে ইংরেজ লণ্ডনে বসে যে অট্টহাসি ছাড়বে আমরা সিলেটে বসে তার শব্দ শুনতে পাব।

উর্দুওয়ালারা বলবেন, 'ক্ষেপেছ? আমরা উর্দু কৃষি রিপোর্ট বাংলাতে অনুবাদ করে চাষার বাড়ীতে পাঠাব।'

উত্তরে আমরা শুধাই সে অনুবাদটি করবেন কে? কৃষি রিপোর্টের অনুবাদ করা তো পাঠশালা-পাসের বাংলা বিদ্যে দিয়ে হয় না। অতএব বাংলা শেখানোর জন্য হাইস্কুলে, বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা পড়াতে হবে। অর্থাৎ আমাদের সক্কলকে স্কুল কলেজে বাংলা উর্দু দুই-ই বেশ ভালো করে শিখতে হবে (কৃষি রিপোর্ট ছাড়া উর্দুতে লেখা অন্যান্য সৎসাহিত্যও তো বাংলাতে তর্জমা করতে হবে); ফলে দুই কুলই যাবে, যেমন ইংরেজ আমলে গিয়েছিল—না শিখেছিলাম, বাংলা লিখতে, না পেরেছিলাম ইংরেজি ঝাড়তে।

ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জার্মানীতে যে উচ্চশিক্ষার এত ছড়াছড়ি, সেখানেও দশ হাজারের মধ্যে একটি ছেলে পাওয়া যায় না যে দুটো ভাষায় সড়গড় লিখতে পারে। আরব, মিশরের আলিম-ফাজিলগণও এক আরবী ছাড়া দ্বিতীয় ভাষা জানেন না।

না হয় সব কিছুই হল কিন্তু তবু মনে হয়, এ বড় অদ্ভুত পরিস্থিতি— যে রিপোর্ট পড়নেওয়ালার শতকরা ৯৯ জন জানে বাংলা সে রিপোর্টের মূল রেখা হবে উর্দুতে! ব্যবস্থাটা কতদূর বদখত বেতালা তার একটা উপমা দিলে আমার বক্তব্য খোলসা হবে: যেহেতু পূর্ব পাকিস্তানে উপস্থিত শ'খানেক রুটি-খানেওয়ালা পাঞ্জাবী আছেন অতএব তাবৎ দেশ ধানচাষ বন্ধ করে গম ফলাও! তা সে আলবাঁধা, জলে-টে-টম্বুর ধানক্ষেতে গম ফলুক আর নাই ফলুক!

উর্দুওয়ালারা তবু বলবেন, 'সব না হয় মানলুম, কিন্তু একথা তো তোমরা অস্বীকার করতে পারবে না কেন্দ্রের ভাষা যে উর্দু সে সম্বন্ধে পাকাপাকি ফৈসালা হয়ে গিয়েছে। পূর্ব পাকিস্তানের লোক যদি উর্দু না শেখে তবে করাচীর কেন্দ্রীয় পরিষদে তাঁরা গাঁকগাঁক করে বক্তৃতা ঝাড়বেনই বা কি প্রকারে, এবং আমাদের ছেলেছোকরারা কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে ডাঙর ডাঙর নোকরি বা করবে কি প্রকারে?'

বক্তৃতা দেওয়া সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য এই যে, আমরা যত ছেলেবেলা থেকে যত উত্তম উর্দুই শিখি না কেন, উর্দু যাঁদের মাতৃভাষা তাঁদের সঙ্গে আমরা কস্মিনকালেও পাল্লা দিয়ে পেরে উঠব না। আমাদের উচ্চারণ নিয়ে উর্দু-ভাষিগণ হাসিঠাট্টা করবেই এবং সকলেই জানেন উচ্চারণের মক্করাভেংচানি করে মানুষকে সভাস্থলে যত ঘায়েল করা যায় অন্য কিছুতেই ততটা সুবিধে হয় না। অবশ্য যাদের গুরদা-কলিজা লোহার তৈরী তাঁরা এ সব নীচ ফন্দি-ফিকিরে ঘায়েল হবেন না কিন্তু বেশীরভাগ লোকই আপন উচ্চারণের কমজোরী বেশ সচেতন থাকবেন, বিশেষত যখন সকলেই জানেন যে প্রথম বহু বৎসর ধরে উত্তম উচ্চারণ শেখবার জন্য ভালো শিক্ষক আমরা যোগাড় করতে পারব না, এবং একথাও বিলক্ষণ জানি যে একবার উচ্চারণ আর মেরামত করা যায় না। দৃষ্টান্তের জন্য বেশী দূর যেতে হবে না। পূর্ববঙ্গের উর্দু ভাষাভাষী মৌলবী সাহেবদের উচ্চারণের প্রতি একটু মনোযোগ দিলেই তাঁদের উচ্চারণের দৈন্য ধরা পড়ে। সে উচ্চারণ নিয়ে পূর্ব বাংলায় 'ওয়াজ' দেওয়া চলে কিন্তু যাঁদের মাতৃভাষা উর্দু তাঁদের মজলিসে মুখ খোলা যায় না। এমন কি দেওবন্দ রামপুর ফের্তা কোনো কোনো মৌলবী সাহেবকে উচ্চারণ ব্যাপারে শরমিন্দা হতে দেখেছি, অথচ বহুক্ষেত্রে নিশ্চয় জানি যে এঁদের শাস্ত্রজ্ঞান দেওবন্দ-রামপুরের মৌলানাদের সঙ্গে অনায়াসে পাল্লা দিতে পারে। কিন্তু এঁরা নিরুপায়, ছেলেবেলা ভুল উচ্চারণ শিখেছিলেন, এখনো তার খেসারতি চালছেন।

কিন্তু কি প্রয়োজন জান পানি করে ছেলেবেলা থেকে উর্দু উচ্চারণে পয়লানম্বরী হওয়ায়? অন্য পন্থা কি নেই?

আছে। গণতন্ত্রের সর্বশ্রেষ্ঠ ভূমি সুইজারল্যাণ্ডে চারটি ভাষা প্রচলিত। তাঁদের পার্লামেন্টে সকলেই আপন আপন মাতৃভাষায় বক্তৃতা দেন। যেসব বক্তৃতা অন্যান্য ভাষায় অনুবাদ করা হয়। উর্দুওয়ালারা প্রশ্ন শুধাবেন এসব বক্তৃতা অনুবাদ করে কারা?

সেই তত্ত্বটা এইবেলা ভালো করে বুঝে নেওয়া দরকার। এই ধরুন, আপনার মাতৃভাষা বাংলা, আপনি উর্দুও জানেন। কিন্তু উর্দুতে বক্তৃতা দিতে গেলে আপনি হিমশিম খেয়ে যান। অথচ অল্প উর্দু জানা সত্ত্বেও যদি আপনাকে কোনো উর্দু বক্তৃতা বাংলা তর্জমা করতে হয় তবে আপনি সেটা অনায়াসে করে নিতে পারেন। রবীন্দ্রনাথ যখন ফ্রান্স, জার্মানী, হল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশে সফর করে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন তখন তিনি দুনিয়ার বাহান্নটা ভাষায় বক্তৃতা দেন নি? বক্তৃতা দিয়েছিলেন হামেশাই ইংরেজিতে এবং অনুবাদকেরা আপন আপন মাতৃভাষায় সেসব বক্তৃতা অনুবাদ করেছিলেন।

মার্শাল বুলগানিন, আইসেনহাওয়ার, চার্চিল, মাও-সে-তুঙ, চিয়াং-কাই-শেক যখন ঘণ্টার পর ঘণ্টা আলাপ আলোচনা করেন— আর চার্চিল তো মামুলি কথা বলতে গেলেও ওজস্বিনী বক্তৃতা ঝাড়েন— তখন সকলেই আপন আপন মাতৃভাষাতেই কথা বলেন। সোভাষী তর্জমানরা সেসব আলাপ-আলোচনার অনুবাদ করেন।

এত বড় যে ইউনাইটেড নেশনস্ অরগেনাইজেশন (উনো), যেখানে দুনিয়ার প্রায় তাবৎ ভাষাই শুনতে পাওয়া যায়; সেও চলে তর্জুমানদের 'মধ্যস্থতায়'।

পাঠক হয়তো বলবেন অনূদিত হলে মূল বক্তৃতার ভাষার কারচুপি অলঙ্কারের ঝলমলানি, গলা ওঠানো-নাবানোর-লম্ফঝম্ফ মাঠে মারা গিয়ে বক্তৃতা রসকষহীন সাদামাটা হয়ে বেড়োয়, ওজস্বিনী বক্তৃতা তখন একঘেয়ে রচনা পাঠের মত শোনায়। সে কথা ঠিক- যদি ও প্রোফেশনাল এবং বিচক্ষণ তর্জুমান মূলের প্রায় শতকরা ৯০ ভাগ জৌলুস রাখতে সমর্থ হন— কিন্তু যখন সব বক্তারই বক্তৃতা অনূদিত হয়ে সাদামাটা হয়ে গেল তখন সকলেই সমান লাভবান বা ক্ষতিগ্রস্ত হলেন।

গুণীরা বলেন, আলাপ-আলোচনা যেখানে ঝগড়া-কাজিয়ায় পরিবর্তিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে সেখানে কদাচ বিপক্ষের মাতৃভাষার কথা বলবে না; তুমি একখানা কথা বলতে না বলতে সে দশখানা বলে ফেলবে। বিচক্ষণ লোক মাত্রই স্টেশনে লক্ষ করে থাকবেন যে হুঁশিয়ার—বাঙালী বিহারী মুটের সঙ্গে কদাচ উর্দুতে কথা বলে না। আর মুটে যদি তেমনি ঘুঘু হয় তবে সেও বাংলা জানা থাকলেও, আপন উর্দু চালায়। তবু তো বিহারী মুটেকে কিছুটা ভালো উর্দু জানা থাকলে ঘায়েল করা যায়, কিন্তু করাচীতে যে-সব উর্দুভাষীদের মোকাবেলা করতে হবে তাঁদের উর্দুজ্ঞান পয়লানম্বরী হবে নিশ্চয়ই। প্রেমালাপের কথা স্বতন্ত্র, সেখানে কোনো ভাষারই প্রয়োজন হয় না, টোটফুটি উর্দু বললেও আপত্তি নেই। তুলসী দাস কহেন,—

'জো বালক কহে তোতরি বাতা
সুনত মুদিত নেন পিতু আরু মাত—'

'বালক যখন আধা-আধা কথা বলে তখন পিতামাতা মুদ্রিত নয়নে (গদগদ হয়ে) সে কথা শোনেন'। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানের সদস্যগণ শুদ্ধমাত্র রাসলাপ করার জন্য করাচী যাবেন না। স্বার্থের দ্বন্দ্ব উপস্থিত হলে, দরকার বোধ করলে তো বাগ্‌বিতণ্ডাও করতে হবে।

কেন্দ্রের ডাঙর ডাঙর নোকরীর বেলাও এই যুক্তি প্রযোজ্য। আমরা যত উত্তম উর্দু শিখি না কেন প্রতিযোগিতাত্মক পরীক্ষায় উর্দু-মাতৃভাষীদের সঙ্গে কখনোই টক্কর দিতে পারব না। অথচ আমরা যদি আমাদের মাতৃভাষা বাংলায় পরীক্ষা দিই, এবং উর্দু-মাতৃভাষীরা তাঁদের মাতৃভাষার পরীক্ষা দেন তবে পরীক্ষায় নিরপেক্ষতা রক্ষা করা হবে। তখন প্রশ্ন উঠবে বাঙালী ছেলেরা উর্দু না জেনে কেন্দ্রে নোকরী করবে কি করে ? উত্তরে বলি, সিন্ধি বেলুচি—ছেলে যে প্রকারে কেন্দ্রে কাজ করবে ঠিক সেই প্রকারে— তাদের মাতৃভাষাও তো উর্দু নয়। পাঠানেরা পশতুর জন্য যে রকম নড়াচড়া আরম্ভ করেছেন তাঁদের ঐ একই অবস্থা হবে। অথবা বলব উর্দু মাতৃভাষীরা যে কৌশলে বাংলাদেশে নোকরী করবেন ঠিক সেই কৌশলে। এ সম্বন্ধে বাকী বক্তব্যটুকু অন্য প্রসঙ্গে বলা হবে।

উর্দুওয়ালারা এর পরও শুধাতে পারেন, "আমরা যদি উর্দ না শিখি তবে কেন্দ্র থেকে যেসব হুকুম, ফরমান, আইন কানুন আসবে সেগুলো পড়ব কি করে ?"

উত্তরে বলি, "তার জন্যে ঢাকাতে তর্জুমানদের ব্যবস্থা করতে হবে।" একথা শুনে উর্দুওয়ালারা আনন্দে লাফ দিয়া উঠবেন। বলবেন, "তবেই তো হ'ল। তর্জুমানদের যখন উর্দু শেখাতেই হবে তখন তামাম দেশকে উর্দু শেখালেই পারো।"

এ বড় অদ্ভুত যুক্তি। উদাহরণ না দিলে কথাটা খোলসা হবে না বলে নিবেদন করি, "আরব, ফ্রান্স, জর্মনী, স্পেন, রুশিয়া, চীন ইত্যাদি দেশে পাকিস্তানের লোক রাজদূত হয়ে যাবে। তাই বলে কি পাকিস্তানের লোককে আমরা দুনিয়ার তাবৎ ভাষা শেখাই ?"

একটা গল্প মনে পড়ল। স্বয়ং কবিগুরু সেটি ছন্দে বেঁধেছেন, তাই সম্পূর্ণ গল্প তাঁর ভাষাতেই বলি—

কহিলা হবু "শুন গো গোবু রায়
কালিকে আমি ভেবেছি সারারাত্র
মলিন ধূলা লাগিবে কেন পায়
ধরণী মাঝে চরণ ফেলা মাত্র ?
শীঘ্র এর করিবে প্রতিকার
নহিলে কারো রক্ষা নাহি আর।"

মন্ত্রী তখন,

অশ্রুজলে ভাসায়ে পাকা দাড়ি
কহিলা গোবু হবুর পাদপদ্মে
যদি না ধূলা লাগিবে তব পায়ে
পায়ের ধূলা পাইব কি উপায়ে।'

সেয়ানা উত্তর। কিন্তু রাজা মন্ত্রীর চেয়েও ঘড়েল তাই বললেন—

"—কথাটা বটে সত্য,
কিন্তু আগে বিদায় করো ধূলি
ভাবিয়ো পরে পদধূলির তত্ত্ব!

তখন নানা তরকিব নানা কৌশলে রাজার পা দুখানকে ধূলা থেকে বাঁচানোর চেষ্টা করা হ'ল। সাড়ে সতেরো লক্ষ ঝাঁটা দিয়ে দুনিয়া সাফ করার প্রথম চেষ্টাতে যখন কোনো ফল হ'ল না তখন 'একুশ লাখ ভিস্তি' দিয়ে জল ঢালার ব্যবস্থা করা হ'ল। তাতেও যখন কিছু হ'ল না তখন;

কহিল মন্ত্রি, "মাদুর দিয়া ঢাকো;
ফরাশ পাতি করিব ধূলা বন্ধ।"
কহিল কেহ, "রাজার ঘরে রাখো
কোথাও যেন না থাকে কোনো রন্ধ্র।"

রাজার কপাল ভালো বলতে হবে, কেউ যে তাঁর পা দুখানা কাটার ব্যবস্থা করলেন না। শেষটায় সমস্বরে,

কহিল সবে, "চামারে তবে ডাকি
চর্ম দিয়া মুড়িয়া দাও পৃথ্বী।"
তখন ধীরে চামার কুলপতি
কহিল এসে ঈষৎ হেসে বৃদ্ধ,
"বলিতে পারি করিলে অনুমতি

সহজে যাহে মানস হবে সিদ্ধ।
নিজের দুটি চরণ ঢাকো, তবে
ধরণী আর ঢাকিতে নাহি হবে।"

এত সোজা সমাধান? তাই তো বটে! এই করেই হ'ল জুতা আবিষ্কার। তিনকুড়ি কেন্দ্রীয় সদস্য, কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে শ'দুই চাকুরে, আরো শ'দুই তর্জুমানের উর্দু জানার প্রয়োজন [হিসেবটা অত্যন্ত দরাজ হাতে করা গেল]; তার জন্য চার কোটি লোককে উর্দু কপচাতে হবে!

না হয় পাঁচ শ' নয়, সাত শ' নয়, পাঁচ হাজার লোকেরই উর্দু বলার প্রয়োজন হবে। তবে তাদের পায়েই উর্দুর জুতা পড়িয়ে দিই; এই ভলভলে কাদার দেশে চার কোটি লোককে জুতো পরাই কোন হস্তী-বুদ্ধির তাড়ণায়?

রবীন্দ্রনাথের গল্পটি এইখানেই শেষ নয়; আমাদের কথাও এখানে ফুরোয় না। আমরা যখন এই জটিল সমস্যার সরল সমাধান বাৎলে দি তখন,

কহিলা রাজা, "এত কি হবে সিধে,
ভাবিয়া ম'ল সকল দেশসুদ্ধে।"

মন্ত্রী কহে,

"বেটারে শূলে বিঁধে
কারার মাঝে করিয়া রাখ রুদ্ধ।"

চামারের মত সরল সমাধান যারা করতে চায় তাদের জন্য শূলের হুকুম জারী হয়। তাদের তখন নামকরণ হয় "এনিমিজ অব্ দি স্টেট্" "আজাঁ প্রভোকাতর"!!

ইতিহাস দিয়ে যদি বা সপ্রমাণ করা যায় যে পূর্ব পাকিস্তানের মত বিশাল দেশের বিপুল সংখ্যক লোককে কখনো তাদের মাতৃভাষা ভুলিয়ে অন্য ভাষা শেখানো সম্ভবপর হয় নি, ইরান তুর্কী প্রভৃতি দেশে এ প্রকারের চেষ্টা সর্বদাই নিষ্ফল হয়েছে, তবে এক রকমের লোক যাঁরা আপন স্বাধিকার প্রমত্ততায় দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে 'নাথিঙ ইজ্ ইমপসিবল্' বুলি কপচান, এ সম্প্রদায়ের লোক যদি দেশের দণ্ডধর না হতেন তবে আমাদের ঐতিহাসিক দলিল-দস্তাবেজই আর পাঁচ-জনকে সত্যনিরূপণ করাতে সমর্থ হত। তাই প্রশ্ন, এসব দণ্ডধরদের সামনে অন্য কোন্ যুক্তি পেশ করা যায়, কি কৌশলে বোঝানো যায় যে পূর্ব পাকিস্তানে ব্যাপকভাবে উর্দু চালানো সম্পূর্ণ অসম্ভব।

ফার্সীতে বলে 'জান-মাল', বাংলায় বলি 'ধন-প্রাণ' মানুষ এই দুই বস্তু বড় ভালোবাসে; ইতিহাস যা বলে বলুক, এই দুই বস্তু যদি মানুষের হাত এবং দেহ ছাড়ার উপক্রম করে তবে দণ্ডধরেরা পর্যন্ত ব্যাকুল হয়ে পড়েন; হাতের পাখী এবং প্রাণপক্ষী বাঁচাবার জন্য তখন ঝোপের 'ইমপসিবল্' চিড়িয়ার তালাসী বন্ধ হয়ে যায়।

তাই প্রথম প্রশ্ন, ঝোপের উর্দু চিড়িয়া ধরতে হলে যে ফাঁদ কেনার প্রয়োজন তার খর্চার বহরটা কি?

ধরা যাক আমরা পূর্ব পাকিস্তানের পাঠশালা, স্কুল, কলেজ সর্বত্র উর্দু চালাতে চাই। পূর্ব পাকিস্তানে ক'হাজার পাঠশালা, ক'জন গুরুমহাশয় দ্বিতীয় শিক্ষক, স্কুলমাস্টার, কলেজ প্রফেসার আছেন জানি না কিন্তু একথা নিশ্চয় জানি যে কেবলমাত্র পাঠশালাতেই যদি আজ

আমরা উর্দু চালাবার চেষ্টা করি তবে আমাদের হাজার হাজার উর্দু শিক্ষকের প্রয়োজন হবে। যেসব শিক্ষকরা আসবেন বিহার এবং যুক্তপ্রদেশ থেকে। তাঁর আটারো-কুড়ি টাকার মাইনেতে পূর্ব বাংলার গাঁয়ে পরিবার পোষণ করতে পারবেন না। আমাদের পাঠশালার পণ্ডিত মশাইদের কিছু কিছু জমি-জমা আছে, কেউ কেউ হালও ধরে থাকেন, এবং তৎসত্ত্বেও তাঁরা যে কি দারিদ্র্যের ভেতর দিয়ে জীবনযাপন করেন সে নিদারুণ কাহিনী বর্ণনা করার মত শৈলী এবং ভাষা আমার কলমে নেই। লেখাপড়া শিখেছেন বলে গ্রামের আর পাঁচজনের তুলনায় এঁদের সূক্ষ্মানুভূতি, মহাজনের ঋণবাকা, জমিদারের রক্তচক্ষু এঁদের হৃদয়-মনে আঘাত দেয় বেশী এবং উচ্চশিক্ষা কি বস্তু তার সন্ধান তাঁরা কিছুটা রাখেন বলে মেধাবী পুত্রকে অর্থাভাবে উচ্চশিক্ষা না দিতে পারাটা এঁদের জীবনের সবচেয়ে বড় ট্র্যাজেডি। 'ইত্তেহাদ', 'আজাদ' মাঝে মাঝে এঁদের হস্তগত হয় বলে এঁরা জানেন যে যক্ষ্মারোগী স্বাস্থ্যনিবাসে বহুস্থলে রোগমুক্ত হয়, হয়তো তার সবিস্তার বর্ণনাও কোনো কবি বাসরীয়তে তাঁরা পড়েছেন এবং তারপর যখন পুত্র অথবা কন্যা যক্ষ্মারোগে চোখের সামনে তিলে তিলে মরে তখন তারা কি করেন, কি ভাবেন আমাদের জানা নেই। বাইবেলি ভাষায় বলতে ইচ্ছে হয়, "ধন্য যাহারা অজ্ঞ, কারণ তাহাদের দুঃখ কম' পণ্ডিতের তুলনায় গাঁয়ের আর পাঁচজন যখন জানে না 'স্বাস্থ্যনিবাস' সাপ না ব্যাঙ না কি, তখন তারা যক্ষ্মারোগকে কিস্মতের গর্দিশ বলেই স্বান্ত্বনা দিতে পারে।

সুদূর যুক্তপ্রদেশ, বিহার থেকে যাঁরা উর্দু শেখাবার জন্য বাংলার জলেভেজা, কাদাভরা, পানাঢাকা, জ্বরেমারা পাড়াগাঁয়ে সপরিবার আসবেন তাঁরা মাইনে চাইবেন কত? আমাদের গাঁয়ে গাঁয়ে ফালতো জমিজমা আর নেই যে চাকরি দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের লা-খেরাজ বা ব-খেরাজ ভূ-সম্পত্তি দিয়ে দেব আর তাঁরা সব কিছু মিলিয়ে মিশিয়ে চন্দ্ রোজের মুসাফিরী কোনো সুরতে গুজার করে নেবেন। তাই তাঁদের মাইনে অন্ততপক্ষে কত হওয়া উচিত, আপনারা এবং আর পাঁচজন গাঁও-বুড়ারা, মাথা মিলিয়ে ধরে দিন। আমরা মেনে নেব।

যত কমই ধরুন না কেন তার দশমাংশ দেবার মত তাগদও পূর্ব পাকিস্তানের শিক্ষামন্ত্রীর নেই (শুধু পূর্ব পাকিস্তানের কেন, এরকম পাগলা প্ল্যান চালাতে চাইলে ইংলণ্ড ফ্রান্সেরও নেই। জমির সার, হালের বদল, কলকবজা কেনা সব কিছুর জন্য পয়সা খরচা বন্ধ করে এই কি এডুকেশনাল এক্সপেরিমেন্ট করার মোকা!

এতক্ষণ 'ধনের' কথা হচ্ছিল, এখন প্রাণের কথাটি তুলি।

বিহার, যুক্তপ্রদেশ থেকে শিক্ষক আনিয়ে তো আমাদের পাঠশালাগুলো ভর্তি করা হ'ল। আটার অভাবে তাঁরা মাসহারা পেয়েও অর্ধাহারী রইলেন।

তা থাকুন, কিন্তু যেসব হাজার হাজার পাঠশালার বাংলা শিক্ষককে পদচ্যুত করে বিদেশীদের জায়গা করা হ'ল তাঁরা যাবেন কোথায়? কোনো দোষ করেন নি, 'এনিমিজ অব্ দি স্টেট' এঁরা নন, এঁদের বরখাস্ত করা হবে কোন হক্কের জোরে, কোন ইসলামি কায়দায়?

পাকিস্তান সফল করেছেন কারা? গ্রামে গ্রামে পাকিস্তানের প্রোপাগাণ্ডা ছড়াল কে, সিলেটের প্লেবিসিটের সময় কুর্তা বিক্রয় করে নৌকা ভাড়া করল কারা, পোলোয় করে মরাণাপন্ন ভোটারকে বয়ে নিয়ে গেল কার বেটা বাচ্চারা?

এরাই লড়বে পাকিস্তান-বিরোধীদের সঙ্গে। এরা কুর্সীনশীন, মোটরসওয়ার পলিটিশিয়ান নয়। এরা লড়তে জানে। দরকার হলে এরা দলে দলে ঢাকার দিকে ধাওয়া করবে, সঙ্গে যাবে তাদের বাধ্য চাষা-মজুর। তাদের সংখ্যা কি হবে অনুমান করতে পারি নে, কিন্তু শুনেছি এক ঢাকা শহরের বাংলাভাষী মুষ্টিমেয় ছাত্র সম্প্রদায়ের হাতেই বাংলা-উর্দু বাবদে কোনো কোনো দণ্ডধর কর্তাব্যক্তি লাঞ্ছিত অপমানিত হয়েছেন। ছাত্ররা শহরবাসী কিন্তু এরা 'গ্রাম্য'; এরা প্রাণের ভয় দেখাতে জানে। 'ধন' তো আগেই গিয়েছিল বিদেশ থেকে শিক্ষক আনিয়ে, তখন আরম্ভ হবে প্রাণের উপর হামলা।

খুদা পানাহ্। আমরা এ অবস্থার কল্পনা করতে পারিনে। আমাদের বিশ্বাস, কর্তাব্যক্তিরা তার বহু পূর্বেই 'কিতাবুন্মুবীন' দেখে 'সিরাতুল মুস্তাকীমের' সন্ধান পাবেন;— 'ওয়া আম্মাস্সাইলা ফলা তনহর' অর্থাৎ 'সাইল (প্রার্থী)দের প্রত্যাখ্যান করো না!'[1] এস্থলে 'সাইল' শব্দ আরবী অর্থে নিতে হবে, উর্দু অর্থে নয়, এবং তা হলে কথাটা আমাদের গরীব গুরুমহাশয়দের বেলাই ঠিক ঠিক খাটে।

হিটলার কুরানের এ আদেশ মানেন নি। যে রোম ও তাঁর সাঙ্গপাঙ্গের কর্মতৎপরতার ফলে তিনি জার্মানীতে তাঁর 'তৃতীয় রাষ্ট্র' গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিলেন সেই ক্ষমতায় যেতে না যেতে তিনি রোম এবং তাঁর প্রধান সহকর্মীদের গুলি করে মেরেছিলেন। আমার দৃঢ়বিশ্বাস আমাদের কর্তাব্যক্তি কুতুবমিনাররা গণতন্ত্রে বিশ্বাস করেন— এবং ইসলামে গণতন্ত্রের অর্থ 'হক্' ও 'সবর'-এর উপর নির্ভর করা (ওয়া তওআসাও বিল্ হক্কি ও তওআসাও বিস্-সবর)।

এ তো গেল পাঠশালার কথা। হয়তো উর্দুওয়ালারা বলবেন যে তাঁরা পাঠশালায় বাংলাই চালাবেন কিন্তু স্কুল-কলেজে পড়াবেন উর্দু। দুরকম শিক্ষাব্যবস্থার অধর্ম ও কুফল আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি; আপাতত শুধু এইটুকু দ্রষ্টব্য যে স্কুল-কলেজে তাবৎ বিষয়বস্তু উর্দুর মাধ্যমিকে পড়াতে হলে উপস্থিত যেসব শিক্ষকরা এসব বিষয় পড়াচ্ছেন তাঁদের সকলকে বরখাস্ত করতে হবে এবং তাঁদের স্থলে যুক্তপ্রদেশ ও বিহার থেকে হাজার হাজার শিক্ষক আনাতে হবে।

কাজেই প্রথম প্রশ্ন, এসব মাস্টাররা কি অন্ন-হারা হওয়ার দুর্দৈবটা চোখ বুজে সয়ে নেবেন? প্রত্যেক অনুন্নত দেশের বেকার সমস্যার প্রধান অংশ সমাধান করে শিক্ষাবিভাগ, কারণ তার হাতে বিস্তর চাকরি। পূর্ব পাকিস্তান সে সমস্যার সমাধান দূরে থাক, পূর্ব পাকিস্তানী বাঙালী শিক্ষকদের বরখাস্ত করে বাইরের লোক ডেকে সৃষ্টি করবেন বৃহৎ বেকার সমস্যা।

দ্বিতীয় প্রশ্ন, ভূগোল, ইতিহাস, অঙ্ক এবং কলেজে পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, কৃষিবিদ্যা, পূর্ত-খনিজ-বৈদ্য-শাস্ত্র পড়াবার জন্য উর্দুভাষী শিক্ষক পাওয়া যাবে তো? ভুললে চলবে না

[1] এই পদের উপর মৌলানা ইউসুফ আলী টীকা : Then there are the people who come with petition—who have to ask for something. They may be genuine beggars asking for financial help or ignorant people asking for knowledge, or timid people asking for some lead or encouragement. The common attitude is to scorn them or repulse them, the scorn may be shown even when alms or assistance is given to them. Such as attitude is wrong—Every petition should be examined and judged on the merits. (সূরা ৯৩ : ১০)

যে পূর্ব পাকিস্তান যদি উর্দুগ্রহণ করে তবে সিন্ধুপ্রদেশ এবং বেলুচিস্তানেও ঠিক আমাদের কায়দায়ই উর্দুমাস্টার, প্রফেসরের চাহিদা ভয়ঙ্কর বেড়ে যাবে। ফলে যখন আমরা ঢাকার স্কুল-কলেজে শিক্ষকদের যে মাইনা দিচ্ছি সে মাইনের চেয়ে দ্বিগুণ অথবা তিনগুণ দিতে হবে এইসব বহিরাগতদের। অত টাকা কোথায়? এবং আমার দৃঢ় বিশ্বাস উর্দুর মাধ্যমিকে উপরে লিখিত তাবৎ বিষয় পড়াবার মত শিক্ষক বিহার, যুক্তপ্রদেশে পাঞ্জাবে প্রয়োজনের দশমাংশও নেই।

তৃতীয় প্রশ্ন, তাবৎ পাঠ্যপুস্তক উর্দুতে লেখবার জন্য গ্রন্থকার কোথায়? প্রয়োজনীয় শিক্ষকের দশমাংশ যখন বাজারে নেই তখন লেখকের দশমাংশও যে পাব না সে তত্ত্বও অবিসংবাদিত সত্য। কিছু বই লাহোর থেকে আসবে সত্য, কিন্তু বাংলার ভূগোল, ইতিহাস, কৃষিবিদ্যা তো লাহোরে লেখা হবে না এবং পূর্ব পাকিস্তানে এসব বিষয় লেখার লোক নেই। এবং যে ব্যবস্থাই গ্রহণ করি না কেন, আমাদের পাঠ্য-পুস্তক লেখকদের রুটি বহু বৎসরের জন্য নির্ঘাৎ মারা যাবে।

চতুর্থ প্রশ্ন, উর্দু ছাপাখানা, কম্পজিটর, প্রুফ-রীডার কোথায়? বাংলা প্রেস, প্রুফ-রীডাররা বেকার হবে যাবে কোথায়?

এবং সর্বশেষ দ্রষ্টব্য : পাঞ্জাব, সীমান্ত প্রদেশের স্কুল-কলেজে এখনো উর্দু শিক্ষার মাধ্যমিক হয় নি। বিবেচনা করি, আস্তে আস্তে হবে। কিন্তু পাঞ্জাবীদের পক্ষে এ কর্ম অপেক্ষাকৃত সরল হবে কারণ উর্দু তাঁদের মাতৃভাষা। দরকার হলে কেঁদে-ককিয়ে তারা উর্দুতে আপন আপন বিষয় পড়াতে পারবেন কিন্তু বাঙালী মাস্টার-প্রফেসারের পক্ষে উর্দু শিখে আপন কর্তব্য সমাধান করতে বহু বহু বৎসর লাগবে। ততদিন আমরা থ্রি-লেগেড রেস রান করি?— বিশেষ করে যখন কিনা পূর্ব পাকিস্তানকে শক্তিশালী রাষ্ট্রাংশ করার জন্য আমাদের কর্তব্য (ফরজ্ বললে ভালো হয়) উর্ধ্বশ্বাসে, দ্রুতগতিতে সম্মুখপানে ধাবমান হওয়া।

উর্দুওয়ালারা যদি বলেন, "না, আমরা ইস্কুল-কলেজে উর্দু দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে শেখাব, আজ যে রকম ফারসী, আরবী, সংস্কৃত অপশনাল সেকেণ্ড ল্যাঙ্গুইজ হিসেবে শেখাচ্ছি", তা হলে এ প্রস্তাবে যে আমাদের বিন্দুমাত্রও আপত্তি নেই শুধু তাই নয়, আমরা সর্বান্তঃকরণে সায় দিই। প্রসঙ্গান্তরে সে আলোচনা হবে।

এ বিষয়ে আরেকটি কথা এই বেলা বলে নেওয়া ভালো। সাধারণত এদিকে কেউ বড় একটা নজর দেন না। আমাদের প্রশ্ন, সব বিষয় পড়াবার জন্য যদি আমরা উর্দু শিক্ষক পেয়েও যাই, উর্দু শিক্ষয়িত্রী পাব কি? না পেলে আমাদের স্ত্রীলোকদের শিক্ষার কি ব্যবস্থা হবে উর্দুওয়ালারা ভেবে দেখবেন কি? আমাদের কাছে পাকাপাকি খবর নেই, কিন্তু শুনতে পাই বাংলা শিক্ষয়িত্রীর অভাবেই আমরা যথেষ্ট কাহিল হয়ে পড়েছি। (এস্থানে উল্লেখ করি শ্রীহট্ট শহরের মহিলা মুসলিম লীগ তথা অন্যান্য মহিলারা বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার জন্য গত নভেম্বর মাস থেকে একটানা আন্দোলন করে যাচ্ছেন। তাঁদের বক্তব্য, 'পাকিস্তান নবজাত শিশুর ন্যায় নবজাত রাষ্ট্র। মাতৃভাষারূপ মাতৃস্তন্য ব্যতীত অন্য যে-কোনো খাদ্য তার পক্ষে গুরুপাক হবে'।)

উর্দুওয়ালারা কেউ কেউ বলে থাকেন— "অতশত বুঝি না, আমরা চাই, বাংলা ভাষার আজ যে পদ পূর্ব পাকিস্তানে আছে ঠিক সেই রকমই থাক, এবং ইংরেজির আসনটি উর্দু

গ্রহণ করুক।" তার অর্থ এই যে উর্দু উচ্চশিক্ষার মাধ্যমিক মিডিয়ম্ অব ইনস্ট্রাক্শন্) হোক।

মাতৃভাষা ভিন্ন অন্য কোনো ভাষা শিক্ষার মাধ্যমিক করলে যে কি প্রাণঘাতী বিষময় ফল জন্মায় তার সবিস্তার আলোচনা না করে উপায় নেই।

প্রথমত পৃথিবীর কোন্ শিক্ষিত সভ্য দেশ মাতৃভাষা ছাড়া অন্য মাধ্যমে শিক্ষা দিচ্ছে? ইংলন্ড, ফ্রান্স, জার্মানী, ইতালি, চীন, জাপান, রুশ, মিশর, ইরাক, তুর্কী, ইরান এমন কোন্ দেশ আছে যেখানকার লোক আপন মাতৃভাষাকে অবমাননা করে আপন দেশ থেকে বিতাড়িত করেছে? আরবী পূত পবিত্র, ঐশ্বর্যশালিনী, ওজস্বিনী ভাষা, কিন্তু কই তুর্কী, ইরান, চীন, জাভার কোটি কোটি লোকে তা আরবীয় মাধ্যমে শিক্ষালাভ করে না, বিদ্যাভ্যাস শাস্ত্রচর্চা করে না। তবে বাংলার বেলায় এ ব্যত্যয় কেন? বাংলা-ভাষা-ভাষী লোকসংখ্যা তো নগণ্য নয়। সংখ্যা দিয়ে যদি ভাষার গুরুত্ব নির্ণয় করি এবং সে নির্ণয়করণ কিছু অন্যায় নয়— তবে দেখতে পাই চীনা, ইংরেজী, হিন্দী-উর্দু, রুশ, জর্মান ও স্পেনিশের পরেই বাংলার স্থান। পৃথিবীতে বাংলা ভাষাভাষীর সংখ্যা ছয় কোটি (পূর্ব পাকিস্তানে প্রায় সোয়া চার কোটি) এবং তার তুলনায় ভুবনবিখ্যাত ফরাসী ভাষায় কথা বলে সাড়ে চার কোটি, ইতালিয়ানে চার কোটি, ফার্সীতে এক কোটি, তুর্কীতে সত্তর লক্ষ, এমনকি আরবীতেও মাত্র আড়াই কোটি। যে ভাষায় এত লোক সাহিত্য সৃষ্টি করবার জন্য সুযোগ অনুসন্ধান করছে তাদের এতদিন চেপে রেখেছিল মৌলবী-মৌলানাদের আরবী-ফারসী-উর্দু এবং পরবর্তী যুগে ইংরেজী। বাংলার সময় কি কখনো আসে নি, সুযোগ কি সে কোনো দিনই পাবে না?

মাতৃভাষা ভিন্ন অন্য মাধ্যমিকে শিক্ষাদানের দৃষ্টান্ত পৃথিবীতে আছে এবং তার ফল কি সেকথাও ঐতিহাসিকদের অবিদিত নয়। ক্যাথলিক জগতের কেন্দ্র অর্থাৎ পোপের সঙ্গে যোগ রাখার প্রলোভনে (আজ পূর্ব পাকিস্তান করাচীর সঙ্গে যুক্ত হওয়ার জন্য যে রকম প্রলুব্ধ) একদা ইয়োরোপের সর্বত্র লাতিনের মাধ্যমিকে শিক্ষাদান পদ্ধতি জনসাধারণের মাতৃভাষার উপর-জগদ্দল পাথরের মত চেপে বসেছিল। এবং সে পাথর সরাবার জন্য লুথারের মত সংস্কারক ও প্রোটেস্ট্যান্ট ধর্মের মত নবীন সংস্কার পদ্ধতির প্রয়োজন হয়েছিল। পরবর্তী যুগে দেখতে পাই ফরাসী লাতিনের জায়গা দখল করেছে এবং তার চাপে দিশে হারা হয়ে ফ্রেডরিক দি গ্রেটের মত জর্মন সম্রাট মাতৃভাষা জর্মনকে অবহেলা করে ফরাসীতে কবিতা লিখেছেন এবং সে কবিতা মেরামত করবার জন্য ফরাসী গুণী ভলতেয়রকে পৎসদামে নিমন্ত্রণ করেছেন। ঠিক সেই রকম রাশিয়ারও অনেক বৎসর লেগেছিল ফরাসীর নাগপাশ থেকে মুক্ত হতে। আজ উর্দুওয়ালারা বাংলাকে যে রকম তুচ্ছতাচ্ছিল্য করছেন ঠিক সেই রকম জর্মন ও রুশ আপন আপন মাতৃভাষাকে অবহেলা করে বহু বৎসর 'যশের মন্দিরে' প্রবেশ লাভ করতে পারেন নি।

এসব উদাহরণ থেকে এইটুকু স্পষ্ট বোঝা যায় যে, যতদিন পর্যন্ত মাতৃভাষাকে শিক্ষার মাধ্যমিক রূপে গ্রহণ না করা হয় ততদিন শিক্ষা সমাজের উচ্চস্তরের গুটিকয়েক সংস্কৃতিবিলাসের উপকরণ হয় মাত্র এবং যেখানে পূর্বে শুধু অর্থের পার্থক্য মানুষে মানুষে বিভেদ আনত সেখানে 'উচ্চশিক্ষা' ও সংস্কৃতির পার্থক্য দুই শ্রেণীর বিরোধ কঠোরতর করে তোলে।

এ দেশে যে ইসলামি শিক্ষা কখনো ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়তে পারে নি তার প্রধান কারণ বাংলার মাধ্যমিকে শাস্ত্রচর্চা করা হয় নি। যে বস্তু মাতৃভাষায় অতি সহজ, অত্যন্ত সরল, বিদেশী ভাষায় সেই বস্তুই অত্যন্ত কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। তখন আরম্ভ হয় স্কুল থেকে পালানোর পালা এবং মধ্যবিত্ত ও ধনীর গৃহের চাপের ফলেই এই দুই শ্রেণীর ছেলে তখনো লেখাপড়া শেখে, কিন্তু অনুন্নত গরীব তখন ভাবে যে পরিবারে যখন কেউ কখনো লেখাপড়া শেখে নি তখন এ ছেলেই বা পারবে কেন, বাপ-দাদার মত এরো মাথায় গোবর ঠাসা।

মাতৃভাষা ভিন্ন অন্য মাধ্যমিকে শিক্ষা দিলে যে দেশের কতদূর ক্ষতি হয় তার সামান্যতম জ্ঞান এখনো আমাদের হয় নি। সে শিক্ষাবিস্তারে যে তখন শুধু অজস্র অর্থব্যয় হয় তা নয়, সে শিক্ষা ছাত্রের বুদ্ধিবৃত্তিকে অবশ করে তোলে, কল্পনাশক্তিকে পঙ্গু করে দেয় এবং সর্বপ্রকার সৃজনী-শক্তিকে কণ্ঠরোধ করে শিক্ষার আঁতুড় ঘরেই গোরস্থান বানিয়ে দেয়।

ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে বলছি—আমার অভিজ্ঞতা কলেজের অধ্যাপক ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষকরূপে অর্জিত—যে পশ্চিমভারতের কার্ভে স্ত্রী-মহাবিদ্যালয়ের ছাত্রীরা যদিও দু'এক দিক দিয়ে বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের চেয়ে পশ্চাৎপদ তবু স্বাধীনভাবে চিন্তা করার ক্ষমতা যেমন তাদের বেশী তেমনি প্রকাশ ক্ষমতা, আত্মপরিচয় দানের নৈপুণ্য তাদের অনেক বেশী। তার একমাত্র কারণ কার্ভে স্ত্রী-মহাবিদ্যালয়ের ছাত্রীরা আপন আপন মাতৃভাষার মাধ্যমিকে লেখাপড়া করে আর বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছেলেরা লেখাপড়া শেখে ইংরেজীর মাধ্যমিকে। কার্ভের মেয়েরা সেই কারণে আপন মাতৃভাষায় নিঃসঙ্কোচে অবাধ-গতিতে আপন বক্তব্য বলতে পারে, বোম্বাই, কলিকাতা, ঢাকার ছেলেরা না পারে বাংলা লিখতে, না জানে ইংরেজী পড়তে।

এ-কাহিনীর শেষ নেই কিন্তু আমাকে প্রবন্ধ শেষ করতে হবে। তাই পাঠককে সবিনয় অনুরোধ করি তিনি যেন শিক্ষা বিভাগের কোনো পদস্থ ব্যক্তিকে এ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করেন। শ্রীহট্টের খ্যাতনামা আলিম মৌলানা সখাওতুল আম্বিয়া প্রমুখ গুণী আমার সম্মুখে বহুবার স্বীকার করেছেন যে মাদ্রাসাতে যদি বাংলা ভাষা সর্বপ্রকার বিষয় শিক্ষার মাধ্যমিক হত তবে আমাদের আরবী-ফার্সীর চর্চা এতদূর পশ্চাৎপদ হত না। এবং কৌতুকের বিষয় এই যে, উর্দুওয়ালারা বাংলাকে এত ইনকার-নফরৎ, তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করেন তাঁদেরও অনেকেই কঠিন বিষয়বস্তু যখন উর্দুতে বোঝাতে গিয়ে হিম্‌সিম্ খেয়ে যান তখন নোয়াখালী, সিলেটের গ্রাম্য উপভাষারই শরণাপন্ন হন।

এত সরল জিনিস উর্দুওয়ালাদের কি করে বোঝাই? কি করে বোঝাই যে পারস্যের লোক যখন ফার্সীর মাধ্যমিকে আরবী (এবং অন্যান্য তাবৎ বিষয়) শিখবে উর্দুর মাধ্যমিকে কোন আজগুবী কাণ্ডজ্ঞানহীনতার তাড়নায়?

এ প্রসঙ্গের উপসংহারে শেষ কথা নিবেদন করি, মাতৃভাষাকে শিক্ষার মাধ্যমিক না করলে সে ভাষা কখনো সমৃদ্ধিশালী হবার সুযোগ পায় না।

স্বরাজ এলো পাকিস্তান হ'ল কিন্তু হায়, গোস্বামী খাসলৎ (মনোবৃত্তি ও আচার-ব্যবহার) যাবার কোনো লক্ষণ তো দেখতে পাচ্ছিনে। এতদিন করমপুর ইংরেজীর গোলামী, এখন স্বেচ্ছায় বরণ করে নিচ্ছি উর্দুর গোলামী। খতম আল্লাহ্ অলা কুপুবিহিম

ইত্যাদি। খুদাতালা তাদের বুকের উপর সীল এঁটে দিয়েছেন। (কুরান থেকে এ অংশটুকু এখানে উদ্ধৃত করার কোনো প্রয়োজন হ'ত না, যদি কোনো কোনো 'মৌলানা' বাংলা ভাষার সমর্থকদের 'কাফির' হয়ে যাওয়ার ফতোয়া না দিতেন)।

এইবার দেখা যাক, বাংলাকে পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয়, সরকারী ও সংস্কৃতিক ভাষারূপে গ্রহণ করতে উর্দুওয়ালাদের আপত্তিটা কি?

তাঁদের প্রধান আপত্তি, বাংলা 'হেঁদুয়ানী' ভাষা। বাংলা ভাষায় আছে হিন্দু ঐতিহ্য, হিন্দু কৃষ্টির রূপ। পূর্ব পাকিস্তানী যদি সে ভাষা তার রাষ্ট্র ও কৃষ্টির জন্য গ্রহণ করে তবে সে হিন্দুভাবাপন্ন হয়ে যাবে।

উত্তরে নিবেদন, বাংলা ভাষা হিন্দু ঐতিহ্য ধারণ করে সত্য, কিন্তু এইটেই শেষ কথা নয়। বাংলা ভাষার জন্ম হয়েছে হিন্দুধর্মের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে।

বুদ্ধদেব যে রকম একদিন বৈদিক ধর্ম ও তার বাহন সংস্কৃতের বিরুদ্ধে ঘোষণা করে তৎকালীন দেশজ ভাষায় (পরে পালি নামে পরিচিত) আপন ধর্ম প্রচার করেন, ঠিক সেই রকম বাংলা ভাষার লিখিত রূপ আরম্ভ হয় বৌদ্ধ চর্যাপদ দিয়ে। পরবর্তী যুগে বাংলা সাহিত্য রূপ নেয় বৈষ্ণব পদাবলীর ভিতর দিয়ে। আজ পদাবলী সাহিত্যকে হিন্দু ধর্মের অংশ হিসাবে গণ্য করা হয় কিন্তু যে যুগে বৈষ্ণব ধর্ম প্রচারিত সে যুগে তাকে বিদ্রোহের অস্ত্রধারণ করেই বেরুতে হয়েছিল। তাই শ্রীচৈতন্য প্রচলিত ধর্ম সংস্কৃতে লেখা হয় নি, লেখা হয়েছিল বাংলায়। সঙ্গে সঙ্গে রামায়ণ মহাভারতের যে অনুবাদ বাংলায় প্রকাশিত হয় তার পেছনে ছিলেন মুসলমান নবাবগোষ্ঠী। কেচ্ছা-সাহিত্যের সম্মান আমরা দি—হিন্দুরা দেন না— এবং সে সাহিত্য হিন্দু ঐতিহ্যের গড়া নয়। এর পর ঊনবিংশ শতাব্দীতে যে বাংলা গদ্যের পত্তন হয় তার অনুপ্রেরণা খৃষ্টান সভ্যতা থেকে। কবি গুরু রবীন্দ্রনাথ নিজেকে হিন্দু বলে স্বীকার করেন কি না, সে কথা অবান্তর— তাঁর অবদান যে উপনিষদ-সংস্কৃতি ও ইয়োরোপীয় প্রভাবের ফলে গঠিত সে কথা অনস্বীকার্য। শ্রীরামকৃষ্ণদেব প্রচলিত নূতন ধারাকে বৈদিক কিংবা সনাতন বলা ভুল, সে ধারা গণ উপাসনার উৎস থেকে প্রবাহিত হয়েছে এবং সে উৎসকে গোঁড়া হিন্দুরা কখনো শ্রদ্ধার চক্ষে দেখেন নি। স্বামী বিবেকানন্দের 'জাতীয়তাবাদে'র মূল বেদ উপনিষদ নয়।

উর্দুওয়ালারা বলবেন, 'এসব খাঁটি হিন্দু না হতে পারে, কিন্তু আর যাই হোক না কেন, ইসলামি নয়।'

আমরা বলি, 'ইসলামি নয় সত্য কিন্তু এর ভেতরে যে ইনকিলাব্ মনোবৃত্তি আছে সেটি যেন চোখের আড়ালে না যায়। এই বিদ্রোহ ভাব বাংলায় ছিল বলে কাজী নজরুল ইসলাম একদিন আপন 'বিদ্রোহ' দিয়ে রবীন্দ্রনাথের তথাকথিত 'মরমিয়াপনার' বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করতে পেরেছিলেন। পূর্ব পাকিস্তানে যে নবীন কৃষ্টি গঠিত হবে সেটা এই বিদ্রোহ দিয়েই আপন বিজয়-অভিযান আরম্ভ করবে।

এস্থলে সম্পূর্ণ অবান্তর নয় বলে আরেকটি কথা বলি: উত্তর ভারতের তাবৎ সংস্কৃত ভাবাপন্ন ভাষার মধ্যে (হিন্দী, মারাঠী, গুজরাতী ইত্যাদি) বাংলাই সবচেয়ে অসংস্কৃত। হিন্দী, মারাঠী পড়বার বা বলবার সময় সংস্কৃত শব্দ খাঁটি সংস্কৃত উচ্চারণে পড়া এবং বলা হয়—'পরীক্ষা' পড়া হয় –'পরীক্ষা', 'আত্মা' পড়া হয় আত্মা'—কিন্তু বাংলায় সংস্কৃত শব্দ, এমনকি সংস্কৃত ভাষা উচ্চারণ করার সময়ও, উচ্চারণ করা হয় বাংলা পদ্ধতিতে। এ বিষয়ে বাঙালী হিন্দু পর্যন্ত উর্দুভাষী মুসলমানের চেয়ে এককাঠি বাড়া। উর্দুভাষী মুসলমান

তার ভাষার সংস্কৃত শব্দ উচ্চারণ করে খাঁটি সংস্কৃত কায়দায়, বাঙালী হিন্দু উচ্চারণ করে 'অনার্য' কায়দায়।

না হয় স্বীকার করেই নিলুম, বাংলা 'হেঁদুয়ানী' ভাষা কিন্তু প্রশ্ন, এই ভাষা এতদিন ধরে ব্যবহার করে পূর্ব পাকিস্তানের মুসলমান কি 'নাপাক', 'হিন্দু' হয়ে গিয়েছে? পাকিস্তান-স্বপ্ন সফল করাতে কি পূর্ব পাকিস্তানের 'না-পাক' মুসলমানদের কোনো কৃতিত্ব নেই? পাকিস্তান-স্বপ্ন কি সফল হল লাহোর, লক্ষ্ণৌর কৃপায়? পূর্ব পাকিস্তানে যারা লড়ল তারা কি সবাই উর্দুর পাবন্দ আলিম-ফাজিল, মৌলানা-মৌলবীর দল? না তো। লড়ল তো তারা যারা উর্দু জানে না, এবং বাংলার জন্য আজ যারা পুনরায় লড়তে তৈরী আছে। এই সব লড়নেওয়ালারা এত দিনকার ইংরেজ আধিপত্য এবং হিন্দু প্রভাবের ফলেও যখন হিন্দুভাবাপন্ন হয়ে যায় নি, তখন পাকিস্তান হওয়ার পর বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করলেই তারা রাতারাতি ইসলামি জোশ হারিয়ে পাকিস্তানের শত্রু বনে যাবে? এ তো বড় তাজ্জব কথা? বাংলা ভাষার এত তাগদ?

দ্বিতীয় বক্তব্য আমরা ইতিহাস নিয়ে আরম্ভ করি। পূর্বেই বলেছি, ফিরদৌসীর আমলে ইরানের সর্বত্র আরবী প্রচলিত ছিল— ইরানের রাষ্ট্রভাষা ছিল আরবী। তখনকার দিনে যেটুকু ফরাসী প্রচলিত ছিল সে ছিল 'কাফির', অগ্নিউপাসক, জরথুস্ত্রীদের ভাষা। সে ভাষায় একেশ্বরবাদের নামগন্ধ তো ছিল না, তাতে ছিল দ্বৈতবাদের প্রচার, এককথায় সে ভাষা ছিল ন'সিকে ইসলাম-বিরোধী, 'কাফিরী'। তবু কেন সে ভাষা চর্চা করা হল, এবং সে চর্চা করলেন কারা? কাফিরী জরথুস্ত্রীরা করে নি, করেছিলেন আরবীজানেওয়ালা মুসলমানেরাই। কেন?

তুর্কীতেও তাই। কেন?

এ দুটো খাঁটি ইসলামি দেশের উদাহরণ; এবার স্বদেশে সেই দৃষ্টান্তই খোঁজা যাক। পাঠান-মোগল যুগে এ দেশে ফার্সী ব-হাল তবিয়তে রাষ্ট্রভাষার রাজসিংহাসনে বসে দিশী ভাষাগুলোর উপর রাজত্ব করত। কিন্তু তৎসত্ত্বেও সেই ফার্সীর সঙ্গে দেশজ হিন্দী মিলিয়ে উর্দু ভাষা কেন নির্মাণ করা হল? কিন্তু সেটা আসল প্রশ্ন নয়, আসল প্রশ্ন যে-হিন্দীকে নিয়ে উর্দু বানানো হল সে ভাষা কি 'পাক' ছিল?

আমরা জানি সে ভাষায় তখন তুলসীদাসের রামায়ণ সর্বশ্রেষ্ঠ পুস্তক—এখনো তাই। সেই পুস্তকের আওতায় সমস্ত হিন্দী সাহিত্য গড়ে উঠেছে এবং তাতে আছে ইসলামদ্রোহী কট্টর মতবাদ। বাল্মীকির রামায়ণে যে ব্যক্তি মানুষ, রাজা এবং বীর, তিনি তুলসীর রামায়ণে খুদ ভগবানের আসন তসরূপ করে বসে আছেন। ইসলামে মানুষকে আল্লাহর আসনে তোলা সবচেয়ে মারাত্মক কুফর্।

আজকের বাংলা ভাষা সেদিনকার হিন্দীর তুলনায় বহুগুণে পাক। আজ বাংলা সাহিত্যে যে ঈশ্বর গানে কবিতায় নন্দিত হচ্ছেন তিনি সুফীর মরমের আল্লা, হক্। তাঁর সন্ধান 'গীতাঞ্জলিতে'—সে পুস্তক তামাম পৃথিবীতে সম্মান লাভ করেছে।

এবার যে দৃষ্টান্ত পেশ করব সেটি সভয়ে এবং ঈষৎ অনিচ্ছায়। দৃষ্টান্তটি কুরানের ভাষা নিয়ে এবং এ জিনিস নিয়ে নাড়াচাড়া করার হক্ আলিম ফাজিলদের। কিন্তু শ্রদ্ধেয় গোলাম মোস্তফা সাহেব যখন রসূলুল্লার জীবনী থেকে নজির তুলে পূর্ববঙ্গবাসী মুসলমানকে 'পাঞ্জাবী প্রভুত্ব' বরদাস্ত করতে উপদেশ দিয়েছিলেন, (মক্কা হইতে

মোহাজেরগণ যখন দলে দলে মদিনায় পৌঁছিতে লাগিলেন, তখন মদিনার আনসারগণ মক্কাবাসীদিগকে সাদরে গ্রহণ করিতেন) আজ তাহারা—পাঞ্জাবীরা—আমাদের দুয়ারে অতিথি। আমাদের কি উচিত নয় তাহাদের প্রতি একটু (!) সহানুভূতি দেখানো?'—(বিস্ময়বোধক চিহ্ন আমার) তখন আমিই বা এমনকি দোষ করলুম?

আরবী ভাষায় কুরানশরীফ যখন অবতীর্ণ হলেন তখন সে ভাষার কি রূপ ছিল? সে-ভাষা কি 'পাক' পবিত্র ছিল, না পৌত্তলিকতার গভীর পঙ্কে নিমজ্জিত ছিল? আমরা জানি লাত, উজ্জা, মনাত প্রভৃতি দেব-দেবীর প্রশস্তিতে সে ভাষা পরিপূর্ণ ছিল এবং একেশ্বরবাদ বা অন্য কোনো সত্যধর্মের (খ্রীস্ট অথবা ইহুদি) কণা মাত্র ঐতিহ্য সে ভাষায় ছিল না।

পক্ষান্তরে আরব দেশে বিস্তর ইহুদি ও খৃষ্টান ছিলেন। (হজরতের বহুপূর্বেই হিব্রুভাষা তওরিত 'তোরা' ও ওল্ড টেস্টামেন্ট') বুকে ধরে পবিত্র ভাষারূপে গণ্য হয়েছিল, এবং হিব্রুর উপভাষা আমারমেইকের মাধ্যমে মহাপুরুষ ইসা ইঞ্জিল (এভানজেলিয়াম' অথবা বাইবেলের 'নিউ টেস্টামেন্ট') প্রচার করেছিলেন। কুরান অবতীর্ণ হবার প্রাক্কালে হিব্রুভাষা একেশ্বরবাদ, মৃত্যুর পরের বিচার এর ফলস্বরূপ স্বর্গ অথবা নরক ইত্যাদি ইসলামের মূল বিশ্বাস (নবুওত ব্যতীত) প্রচারের ফলে হিব্রু ভাষা সেমিতি ধর্মজগতে সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করেছিল।

তবু কেন সে ভাষায় অবতীর্ণ না হয়ে কুরান শরীফ পৌত্তলিকের ভাষায় নাজিল হলেন।

এ পরম বিস্ময়ের বস্তু এবং শুধু আমরাই যে আজ বিস্মিত হচ্ছি তা নয়, স্বয়ং মহাপুরুষের আমলেও বিস্ময় বহুমুখে সপ্রকাশ হয়েছিল।

কিন্তু সে বিস্ময়ের সমাধান স্বয়ং আল্লাহতাল্লা কুরান শরীফে করে দিয়েছেন। পাছে বাংলা অনুবাদে কোনো ভুল হয়ে যায় তাই মৌলানা আব্দুলা য়ুসুফ আলীর কুরান-অনুবাদ থেকে শব্দে শব্দে তুলে দিচ্ছি। আল্লা বলেন,

"Had we sent this as
A Quran (in a language)
Other than Arabic, they would
Have said : 'Why are not
It's verses explained in detail?
What ! (a Book) not in Arabic
And (a Messenger) an Arab?"

অর্থাৎ "আমরা যদি আরবী ভিন্ন অন্য কোনো ভাষায় কুরান পাঠাতুম তা হলে তারা বলত এর বাক্যগুলো ভালো করে বুঝিয়ে বলা হল না কেন? সে কি? (বই) আরবীতে নয় অথচ (পয়গম্বর) আরব!"

খুদাতালা স্পষ্ট ভাষায় বলছেন, আরব পয়গম্বর সে আরবী ভাষায় কুরান অবতরণের আধার হবেন সেই তো স্বাভাবিক, এবং অন্য যে-কোন ভাষায় সে কুরান পাঠানো হলে মক্কার লোক নিশ্চয়ই বলত, 'আমরা তো এর অর্থ বুঝতে পারছি নে।'

কুরানের এই অঙ্গুলীনির্দেশ মত চললেই বুঝতে পারব ভাষার কৌলীন্য অকৌলীন্য অত্যন্ত অবান্তর প্রশ্ন, আসল উদ্দেশ্য ধর্মপুস্তক যেন আপামর জনসাধারণ বুঝতে পারে।

বারবার কতবার কুরানে বলা হয়েছে, 'এ-বই খোলা বই', 'এ-বই আরবীতে অবতীর্ণ হল' যাতে করে সর্বসাধারণের জন্য এ-বই সরল দিগ্‌দর্শক হতে পারে।

'সর্বসাধারণ সনাতন ধর্মের বাণী মাতৃভাষায় বুঝুক' এই মাহাত্ম্য যে কত গাম্ভীর্যপূর্ণ এবং গুরুত্বব্যঞ্জক সেকথা আমরা এখনো সম্পূর্ণ হৃদয়ঙ্গম করতে পারি নি।

আমার ব্যক্তিগত বিশ্বাস পূর্বাচার্যগণ এ বাণী হৃদয়ঙ্গম করতে সক্ষম হয়েছিলেন, এবং সক্ষম হয়েছিলেন, বলেই বুঝতে পেরেছিলেন যে, ধর্মজ্ঞান যদি মুষ্টিমেয় পণ্ডিতের বিদ্যাচর্চার বিলাসবস্তু না হয়ে আপামর জনসাধারণের নিত্য অবলম্বনীয় সত্যরূপে সপ্রকাশ হ'তে চায় তবে সে ধর্মশিক্ষা মাতৃভাষাতেই দিতে হবে। কোনো বিদেশী ভাষা দ্বারা জনসাধারণকে ব্যাপকভাবে ধর্ম শিক্ষা দেওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব, মাতৃভাষার সাহায্য নিতেই হবে, তা সে-মাতৃভাষা পূতপবিত্রই হোক্ আর ওছা নাপাকই হোক। এ তত্ত্বটা ইরানের মনীষীরা অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে বুঝতে পেরেছিলেন বলেই একদা ইরানে আরবীর বহুল প্রচার থাকা সত্ত্বেও 'নাপাক' ফার্সী ভাষাকে ধর্মশিক্ষার বাহনরূপে ব্যবহার করেছিলেন। ভারতীয় মনীষীরা ঠিক সেই কারণেই এদেশে বিদেশী ফার্সী প্রচলিত থাকা সত্ত্বেও 'না-পাক' হিন্দীর সঙ্গে আরবী ফার্সী মিলিয়ে উর্দু নির্মাণ করেছিলেন।

বাংলাদেশের মৌলবী-মাওলানারা সস্তায় কিস্তিমাত করতে চেয়েছিলেন বলেই দেশজ বাংলাকে ধর্মশিক্ষার বাহন রূপে স্বীকার করেন নি— উর্দু দিয়ে ফাঁকতালে কাজ সারিয়ে নেবার চেষ্টাতেই ছিলেন। তাই পূর্ব পাকিস্তানকে আজ এই খেসারত দিতে হচ্ছে যে, 'নিজ বাসভূমে, পরবাসী হওয়ার' মত নিজ মাতৃভাষায় যে-কোনো কিছুরই চর্চা করতে পারে নি। যুক্তপ্রদেশে তথা পাঞ্জাবের মৌলবী-মাওলানাগণ যে রকম মাতৃভাষা উর্দুর সাহায্যে শাস্ত্রচর্চা করেছিলেন, বাঙালী আলিমগণও যদি বাংলায় সে-রকম শাস্ত্রচর্চা করে রাখতেন তা হলে সেই সূত্রপাতের খেই ধরে আজ বাঙালী মুসলমান নানা সাহিত্য নির্মাণ করে অনেক দূর এগিয়ে যেতে পারত। এবং যখন দেখি, যে-বাঙালী আলিমগণ বাংলায় শাস্ত্রচর্চা না করে বাংলাদেশের আপামর জনসাধারণকে অজ্ঞ রাখলেন তাঁরাই বাঙালী তরুণকে তার ধর্মশাস্ত্রের অজ্ঞাত নিয়ে তাচ্ছিল্য অবহেলা করেন তখন বিস্ময়ে বাক্যস্ফুরণ হয় না। আপন কর্তব্যচ্যুতি ঢাকবার এই কি সরলতম পন্থা? এবং, তাঁরা এ কথাটাও বুঝলেন না যে, বাঙালী হিন্দু যে রকম সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতকে শাস্ত্রগ্রন্থ বাংলাতে অনুবাদ ও প্রচার করার জন্য শ্রদ্ধাঞ্জলি দেয়, তাঁরাও বাংলায় ইসলামী শাস্ত্রের চর্চা করলে বাঙালী মুসলমানের কাছ থেকে সে রকম শ্রদ্ধাঞ্জলি পেতেন।

আবার বলি, এখনো সময় আছে। উর্দু-বাংলার মাঝখানে দাঁড়িয়ে তাঁরা সরল বাংলা (লিসানু-মুবীন) গ্রহণ করবেন, না আবার উর্দু দিয়ে ফোকটে কাজ সারবার তালে থাকবেন?

ধর্মজগতে পোপকে একদা এই দ্বন্দ্বের সম্মুখীন হতে হয়েছিল। তাঁর খাস-পেয়ারা লাতিন সর্বদেশের সর্বমাতৃভাষাকে পদদলিত করে—

পাকা রাস্তা বানিয়ে বসে দুঃখীর বুক জুড়ি,—
ভগবানের ব্যথার 'পরে হাঁকায় সে চার-ঘুড়ী

— করবে, না তিনি লুথারের প্রস্তাবমত মাতৃভাষায় শাস্ত্রচর্চা করতে দেবেন? পোপ সত্যপথ দেখতে পান নি, তিনি ভুল করেছিলেন। ফলে খ্রীষ্টজগৎ দ্বিখণ্ডিত হয়ে গেল।

আজ যদি জোর করে পোপের ভ্রান্তদর্শ অনুসরণ করে উর্দুওয়ালা পূর্ব পাকিস্তানের স্কন্ধে উর্দু চাপান তবে লুথারের মত লোক পূর্ব পাকিস্তানে খাড়া হতে পারে। যাঁরা অখণ্ড পাকিস্তান চান তাঁরা এই কথাটি ভেবে দেখবেন।

ভাষার 'পাকী' 'না-পাকী' সম্বন্ধে আমার শেষ দ্বিধাটি এইবার নিবেদন করি আমরা যে এত তর্কাতর্কি করছি, কিন্তু নিজের মনকে কি একবারও জিজ্ঞেস করেছি 'পাকিস্তান' শব্দটির জন্ম কোথায়, সে জাতে 'পাক', 'না 'নাপাক' ? 'পাক' কথাটা তো আরবী নয়, স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি 'প' (অথবা 'পে') অক্ষরটি আরবী নয়, 'প' অক্ষরটি ফার্সী অর্থাৎ প্রাচীন ইরানী অর্থাৎ অগ্নি-উপাসক কাফিরদের শব্দ, এবং জেন্দা-আবেস্তার শব্দটির সঙ্গে যুক্ত আছে সংস্কৃত 'পক্ব শব্দ ('পাক্ শব্দটি সংস্কৃত নয়, কিন্তু আবেস্তা ও সংস্কৃত যমজ-ভাষা) এবং 'স্তান কথাটি যে সংস্কৃত স্থানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সে কথাও সকলেই জানেন। দুটি শব্দই আরবী নয়, প্রাচীন ইরানী, এবং প্রাচীন ইরানী বাংলা অপেক্ষা কোনো দিক দিয়ে "পাক্" নয়। ভাষার দিকে গিয়ে যদি সত্যই সম্পূর্ণ "পাক্" নাম দিতে হয় তবে তো পাকিস্তানকে 'বয়তুল মুকদ্দাসের' ওজনে মুমলকতুল মুকদ্দস' জাতীয় কোনো নাম দিতে হয়।

তাই বলি 'পাক' 'না-পাকের' প্রশ্ন শুধানো ইসলাম-ঐতিহ্য পরিপন্থী।

কোনো মানুষকে না-পাক বলে যেমন তাকে কলমা থেকে বঞ্চিত করা যায় না, কোনো ভাষাকে ঠিক তেমনি 'না-পাক' নাম দিয়ে ইসলামি শিক্ষা-ঐতিহ্যর বাহক হওয়া থেকে বঞ্চিত করা যায় না। 'ছুৎ বাই' ইসলামি মার্গ নয়।

কেন্দ্রের সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপন, কেন্দ্রের চাকরি, কেন্দ্রীয় পরিষদে বক্তৃতাদান ইত্যাদি। বিষয়ে বাংলা কতদূর প্রতিবন্ধক হবে-না-হবে সে বিষয়ে আলোচনার অন্য প্রসঙ্গে প্রবন্ধের গোড়ার দিকে করা হয়ে গিয়েছে। বাংলাকে পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করা সম্বন্ধে আর যেসব ছোটখাটো আপত্তি আছে তার অন্যতম ব্যবসাবাণিজ্য।

উর্দুওয়ালারা বলেন, "ইংরেজি তাড়িয়ে দিলুম, উর্দু শিখলুম না, তা হলে পশ্চিম পাকিস্তানের সঙ্গে ব্যবসা করব কি করে ?"

এর উত্তর এতই সরল যে দেওয়াটা বোধ হয় নিষ্প্রয়োজন। ইংলন্ডের শতকরা ৯৯ জন ফরাসী জানে না, ফ্রান্সের ৯৯৯জন ইংরেজি জানে না, তৎসত্ত্বেও ব্যবসা চলে। তার চেয়েও সরল উদাহরণ আছে। মারোয়াড়ীরা প্রায় এক শ' বৎসর ধরে বাংলাদেশ শুষে খাচ্ছে, আমাদের কফনের কাপড় বিক্রি করে তারা মারায়োড়ে তিনতলা বাড়ী বানায় কিন্তু সমস্ত মারোয়াড় দেশে বাংলা পড়বার জন্য একটা স্কুল নেই, কোনোকালে ছিলও না। এসব তো হল খুচরা ব্যবসায়ের কথা। প্রদেশে প্রদেশে, দেশে দেশে ব্যবসায়ের যোগাযোগ হয় বড় বড় কারবারীদের মধ্যস্থতায়। দমস্কসে যে জর্মন ভদ্রলোক সীমেন শুকাটের্র কলকবজা বিক্রয় করতেন তিনি তড়বড় করে আরবী বলতে পারতেন— তাই বলে গোটা জার্মানীর পাঠশালা স্কুলে তো আরবী পড়ানো হয় না।

পূর্ব পাকিস্তানের সঙ্গে পশ্চিম পাকিস্তানের যে বড় বড় ব্যবসা হবে, সে হবে করাচীর সঙ্গে। করাচীর ভাষা সিন্ধী—কারবারী মহলে চলে ইংরেজী, সিন্ধী এবং কিঞ্চিৎ গুজরাতী। ব্যবসায়ের জন্য ভাষা শিখতে হলে তো আমাদের সিন্ধী শিখতে হয়।

ব্যবসা যে করে ভাষার মাথা-ব্যথা তার। শিক্ষা বিভাগ এবং দেশের দায়িত্ব এইটুকু

যে বিশ্ববিদ্যালয়ের কমার্স বিভাগে তার জন্য সামান্যতম বন্দোবস্ত করে দেওয়া। সেটুকু কেন তার চেয়ে ঢের বেশী উর্দু আমরা পূর্ব পাকিস্তানে শেখাব। সে-কথা পরে হবে।

এ জাতীয় খুঁটিনাটি আরো অনেক সমস্যা আছে কিন্তু তা হলে মূল বক্তব্য কথাই পৌঁছানো যাবে না।

উর্দু-বাংলা দ্বন্দ্বের শেষ সমাধান করতে হলে বিচার-বিবেচনা অবশ্যক যে পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আদর্শ কি ? —আশা করি একথা কেউ বলবেন না যে একমাত্র উর্দুর সেবা করার জন্যই পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

পাকিস্তান তথা পূর্ব পাকিস্তানের আদর্শ কি সে সম্বন্ধে আমার ব্যক্তিগত মত দেবার কোনো অর্থ হয় না। নানা গুণী যে নানা মত দিতেছেন তার মাঝখানে একটি সত্য কথা সকলেই স্বীকার করে নিয়েছেন ···· সে হচ্ছে এই যে, পাকিস্তানকে সর্বপ্রথম সমৃদ্ধবান রাষ্ট্র করতে হবে।

তা হলেই প্রশ্ন উঠবে সমৃদ্ধশালী হতে হলে যে শক্তির প্রয়োজন সে শক্তি সুপ্তাবস্থায় আছে কোনখানে ?

পাকিস্তান তথা ভারত ইউনিয়নের স্বাধীনতা যে সফল হল তার প্রধান কারণ গণ-আন্দোলন। যত দিন কংগ্রেস বলতে 'স্টেটসমেনের' ভাষায় 'ভদ্রলোক ক্লাস', যত দিন লীগ বলতে রামপুর ভূপাল খানবাহাদুর খানসায়েবেদের বোঝাত ততদিন ইংরেজ 'স্বরাজ' এবং 'পাকিস্তানের' থোড়াই পরোয়া করেছে। কিন্তু যেদিন দেখা গেল যে লীগের পশ্চাতে জনসাধারণ এসে দাঁড়িয়েছে, অর্থাৎ লীগ আন্দোলন গণ-আন্দোলনের রূপ ধারণ করেছে সেদিন আর পাকিস্তানের দাবী কেউ ঠেকিয়ে রাখতে পারল না। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হয়েছে জনসাধারণের শক্তি প্রয়োগে।

জনসাধারণের সেই শক্তি সেদিন বিদ্রোহের রূপ ধারণ করেছিল। আজ সে শক্তি সুষুপ্ত, এবং সেই শক্তি যদি পাকিস্তান গঠনে নিয়োজিত না হয় তবে পাকিস্তান কখনই পূর্ণাবয়ব, প্রাণবন্ত রাষ্ট্ররূপে দুনিয়ার মজলিসে আসন নিতে পারবে না। মার্কসবাদের মূল সিদ্ধান্ত ঠিক কিনা সে আলোচনা এস্থলে সম্পূর্ণ অবান্তর, ইসলামের সঙ্গে যাঁদের সামান্যতম পরিচয় আছে তাঁরাই জানেন, ইসলাম কোনো বিশেষ বর্ণ, জাতি বা শ্রেণীকে শ্রেষ্ঠত্বের আশীর্বাদ দিয়ে অজরামর করে তুলতে সম্পূর্ণ নারাজ।

যাঁরা ধর্মকে—তা সে ইসলামই হোক্ আর হিন্দু ধর্মই হোক্—রাজনীতি থেকে বাদ দিয়ে রাষ্ট্র চালাতে চান তাঁদের উদ্দেশ্যে আমার এস্থানে দু-একটি বক্তব্য আছে। ধর্মে বিশ্বাস করুন আর নাই করুন, ধর্ম যে এ দুনিয়ায় এখনো প্রচণ্ড শক্তির আধার সেকথা অস্বীকার করলে আমরা রাজনৈতিক ক্ষেত্রে প্রতি পদে অপ্রত্যাশিত সঙ্কটের সম্মুখে উপস্থিত হব। এই যে আমরা বারবার শুনতে পাই ইয়োরোপ নাস্তিক, ইয়োরোপীয় রাজনীতি ধর্মকে উপেক্ষা করে চলে সে-কথাটা কতদূর সত্য ? ফ্রান্স জর্মনীতে এখনো ক্রীশ্চান পার্টিগুলো কতটা শক্তি ধারণ করে সে কথা সবচেয়ে বেশী জানেন কম্যুনিস্টরা। ক্রীশ্চান ডেমোক্রেট, ক্যাথলিক সেন্টার এদের অবহেলা করে কোন ব্যাপক রাজনৈতিক আন্দোলন চালানো এখনো ফ্রান্স, জর্মনী, ইতালিতে অসম্ভব। এই তো সেদিন রাজনীতিক্ষেত্রে এখনো পোপের কত ক্ষমতা সেটা ধরা পড়ল ইতালির গণভোটে। পোপ

এবং তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গ যেদিন সশরীরে কম্যুনিস্টদের বিরুদ্ধে আসরে নামলেন সেদিন কমরেড তল্লাত্তি প্রমাদ গুনলেন। শেষ রক্ষার জন্য ধর্মহীন তল্লাত্তিকে পর্যন্ত বলতে হল ভবিষ্যৎ ইতালিয় কম্যুনিস্ট রাষ্ট্রে ধর্মপ্রতিষ্ঠানের সম্পত্তি, বিষয়-আশয়ে কোনো প্রকার হস্তক্ষেপ করা হবে না, এযাবৎ তাঁরা যেসব সুখ-সুবিধা উপভোগ করে আসছেন তার সব কটাই তাঁরা নিশ্চিন্ত মনে উপভোগ করতে পারেন। কিন্তু এ শ্মশান-চিকিৎসায়ও ফল হল না, তল্লাত্তির নির্মম পরাজয়ের কথা সকলেই জানেন। পোপ এই ভোট-মারে নেবে ভালো করেছিলেন কি মন্দ করেছিলেন সে প্রশ্ন এখানে অবান্তর, আমাদের শুধু এইটুকুই দেখানো উদ্দেশ্য যে ধর্ম এখনো বহু শক্তি ধারণ করে।

মৃত্যুর পর বেহেশৎ বা মোক্ষ দান করাই ধর্মের একমাত্র উদ্দেশ্য নয়। বিশেষত ইসলাম সংসারের সর্বস্ব ত্যাগ করে, গুহা-গহ্বরে বসে নাসিকাগ্রে মনোনিবেশ করার ঘোরতর বিরুদ্ধ মতবাদ প্রচার করে। আল্লাতা'লা, কুরানশরীফে বারংবার বলেছেন যে এইসংসারে তিনি নানারকম জিনিস মানুষকে দিয়েছেন তার আনন্দ বর্ধনের জন্য। তাই মুসলিম মাত্রই প্রার্থনা করে, 'হে আমাদের প্রভু, ইহলোকে আমাদের শুভ হোক, পরলোকে আমাদের শুভ হোক।' এর থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়, ইহলোকের মঙ্গল অতীব কাম্য, তাই প্রশ্ন ওঠে পার্থিব বস্তু কোন পদ্ধতিতে উপভোগ করব যাতে করে অমঙ্গল না হয়?

তাই বিশেষ করে ইসলামই পার্থিব বস্তুর ভাগবাঁটোয়ারা সম্বন্ধে অত্যন্ত সচেতন। কুরানশরীফ বারংবার ধনবণ্টন পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করেন, এবং সে-বিষয়ে প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত দেন।

মহাপুরুষ মহম্মদের (দ.) সঙ্গে মক্কাবাসীদের দ্বন্দ্ব হওয়ার অন্যতম প্রধান কারণ পার্থিব বস্তুর নবীন বণ্টন পদ্ধতি নিয়ে। 'সাইল' অর্থ ভিখারী নয় 'সাইল' বলতে আজকাল আমরা ইংরেজীতে 'হ্যাভ নট' বাক্যে যা বুঝি তাই। 'সাইলকে বিমুখ করো না' এই আদেশ মক্কার ধনপতিগণ গ্রহণ করতে কিছুতেই সম্মত হয় নি, অথচ এই নবীন পদ্ধতি দুঃস্থ নিপীড়িত বিত্তহীনদের প্রাণে নূতন আশার বাণী এনে দিয়ে দিয়েছিল। ফলে দেখতে পাই মহাপুরুষের প্রথম শিষ্যদের ভেতর বিত্তহীন ও দাসের সংখ্যা বেশী।

ইহকাল পরকালের মঙ্গল আদর্শ নিয়ে এই যে আন্দোলন সৃষ্ট হল তার বিজয় অভিযান পৃথিবীর ইতিহাসে আপন স্থান করে নিয়েছে— কিন্তু সে ইতিহাস আলোচনা করা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। আমি শুধু এইটকু দেখতে চাই, মহাপুরুষের চতুর্দিকে যে বিরাট আন্দোলন ক্রমে ক্রমে জাগ্রত হল সে আন্দোলন গণ-আন্দোলন। মহাপুরুষ যে নবীন আন্দোলন সফল করে তুললেন সে এই জনগণের সাহায্যে।

আজ পাকিস্তান যে বিরাট আন্দোলনের সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে সে আন্দোলন জনগণ দিয়েই গঠিত হবে। এ আন্দোলনে থাকবে নূতন ধনবণ্টন পদ্ধতি, নূতন ধনার্জন পন্থা, শিক্ষার প্রসার, গণতান্ত্রিক নির্বাচন-পন্থা, স্বাস্থ্যের উন্নতি, সংস্কৃতি- বৈদগ্ধ্য নির্মাণপ্রচেষ্টা,— এককথায় প্রাচীন শোষণনীতি সমূলে উৎপাটন করে সাম্যমৈত্রী-স্বাধীনতার সর্বাঙ্গীণ সম্পূর্ণ বিকাশ।

কিন্তু যদি জনগণ এ আন্দোলনে অংশীদার না হয় তবে সমস্ত আন্দোলন ব্যর্থ হবে। জনসাধারণ যদি আন্দোলনের উদ্দেশ্য বুঝতে না পারে এবং না বুঝতে পেরে আপন

প্রচেষ্টা নিয়োগ করতে কুণ্ঠিত হয়, অথবা প্রয়োজনমত স্বার্থত্যাগ করতে প্রস্তুত না হয় কিংবা ধনপতিদের উৎকোচে বশীভূত হয়, অথবা দু'চার আনা মজুরী বৃদ্ধিতেই বৃহত্তর স্বার্থকে ত্যাগ করে তবে সম্পূর্ণ আন্দোলন নিষ্ফল হবে।

এবং এস্থলে আমার কণ্ঠে যত শক্তি আছে তাই দিয়ে আমি চিৎকার করে বলতে চাই, মাতৃভাষা বাংলার সাহায্য বিনা জনসাধারণকে এই বিরাট আন্দোলনের বিস্তৃত শাখাপ্রশাখা সম্বন্ধে সচেতন এবং ওয়াকিব-হাল করা যাবে না, যাবে না, যাবে না, যাবে না।

উর্দুওয়ালারা বলবেন,—উচ্চশিক্ষা উর্দুর মাধ্যমিকে দেব বটে কিন্তু শিক্ষকেরা কেতাব লিখবেন বাংলায়।

আমার বক্তব্য,—ঠিক ঐ জিনিসটেই হয় না, কখনো হয় নি। দৃষ্টান্তস্বরূপ দেখুন ইংরেজ আমাদিগকে কখনো ইংরেজি বই লিখতে বাধ্য করে নি, তবুও ভারতবর্ষ সম্বন্ধে গত একশত বৎসর ধরে যত উত্তম উত্তম ইতিহাস, রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজতত্ত্ব, দর্শন সম্বন্ধে বই বেরিয়েছে তার শতকরা ৯৫ খানা ইংরেজীতে কেন, জ্ঞানচর্চা করব একভাষায় আর তার ফল প্রকাশ করব অন্য ভাষায়, এই বন্ধ্যা-প্রসব কখনো কস্মিনকালেও হয় না। মানুষ যখন আপন মাতৃভাষায় জ্ঞানবিজ্ঞানের বিষয় চিন্তা করতে শেখে তখনই সে মাতৃভাষায় লিখতে শেখে।

অর্থাৎ ইংরেজী আমলে যা হয়েছিল তারি পুনরাবৃত্তি হবে। একদল উর্দুশিক্ষিত লোক উর্দুতে লেখাপড়া শিখবেন, বড় নোকরি করবেন, বহিরাগত উর্দুভাষীদের সঙ্গে কাঁধ মিলিয়ে এক নূতন অভিজাত সম্প্রদায় সৃষ্টি করবেন, আর বাদবাকি আমরা চাষাভূষো পাঁচজন যে তিমিরে ছিলুম সেই তিমিরেই থাকব।

তাই পুনরায় স্মরণ করিয়ে দি, হজরতের চতুর্দিকে যে আন্দোলনের সৃষ্টি হয়েছিল, এবং পরে যে রাষ্ট্র-সংগঠন অভিযান আরম্ভ হয়েছিল তার মাধ্যমিক ছিল আপামর জনসাধারণের ভাষা,—আরবী। বিদগ্ধ হিব্রুকে তখন সম্পূর্ণ উপেক্ষা করা হয়েছিল।

উর্দুওয়ালারা বলবেন— বাংলা জানলেই কি সব বাংলা বই পড়া যায়? বিশ্ববিদ্যালয়ে যদি বাংলা চালাই, এবং ফলে যদি সকল রকমের বই-ই বাংলাতে লেখা হয় তা হলেই কি আপমর জনসাধারণ সেসব বই পড়তে পারবে?

উত্তরে বলি, সকলে পারবে না, কিন্তু অসংখ্য লোক পারবে?

আমি যে শিক্ষা-ব্যবস্থার স্বপ্ন দেখছি তাতে দেশের শতকরা নব্বই জন মাইনর, ম্যাট্রিক পর্যন্ত পড়বে। এবং সে মাইনর, ম্যাট্রিকের শিক্ষাদান অনেক বেশী উন্নত পর্যায়ের হবে। ইংরেজী বা উর্দুর জন্য জান পানি করবে না বলে তারা অতি উত্তম বাংলা শিখবে এবং ইংলণ্ড, ফ্রান্স, মিশর, ইরানে যে রকম সাধারণ শিক্ষিত লোক মাতৃভাষায় লেখা দেশের শ্রেষ্ঠ পুস্তক পড়তে পারে এরাও ঠিক তেমনি দেশের উন্নততম জ্ঞানচর্চার সঙ্গে সংযুক্ত থাকবে। দেশের তাবৎ লোকই যে উত্তম উত্তম পুস্তক পড়বে সেকথা বলা আমার উদ্দেশ্য নয়—কারণ সকলেই জানেন জ্ঞানতৃষ্ণা কোনো বিশেষ শ্রেণী বা সমাজের মধ্যে নিবদ্ধ নয়, এমনকি উচ্চশিক্ষা পাওয়া না পাওয়ার উপরও সে জিনিস সম্পূর্ণ নির্ভর করে না, কত বি-এ, এম-এ, পরীক্ষা পাশের পর চেক্ বই ছাড়া অন্য কোনো বইয়ের সন্ধানে "সময় নষ্ট" করেন না, আর কত মাইনরের ছেলে গোগ্রাসে যা পায় তাই গেলে—কিন্তু মাতৃভাষা দেশের সর্বোত্তম প্রচেষ্টার সঙ্গে সংযুক্ত হতে পারে। এর সত্যতা সপ্রমাণ হয়

আরেকটি তথ্য থেকে—ইউরোপের বহু সাহিত্যিক, ঐতিহাসিক-আবিষ্কর্তা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন না করেও যশস্বী সৃষ্টিকার হতে সমর্থ হয়েছেন।

তাই দেখতে হবে, মাতৃভাষার যে নির্ঝরিনী দিয়ে বিদ্যাভ্যাস আরম্ভ, সেই নির্ঝরিনীই যেন বিশাল এবং বিশালতর হয়ে বিশ্ববিদ্যার অগাধ সমুদ্রে গিয়ে পৌঁছয়। মাঝখানে ইংরেজী বা উর্দুর দশ হাত শুকনো জমি থাকলে চলবে না।

বিশেষ করে উর্দুওয়ালা মৌলবী-মৌলানাদের এ কথাটি বোঝা উচিত। বাংলাতে ধর্মচর্চা না করার ফলে পূর্ব পাকিস্তানের সাধারণত মুসলিম ধর্মের কুসংস্কারে নিমজ্জিত। ডান দিক থেকে বাঁ দিকে ছাপা বই দেখলেই সে ভয়ে ভক্তিতে বিমূঢ় হয়ে যায়—তা সে গুল্-ই-বাকাওলির কেচ্ছাই হোক আর দেওয়ান-ই চিরকীন্ই হোক্। রাষ্ট্রকে শক্তিশালী করবার জন্য তাকে শেখাতে হবে :

১. ইসলামের ইতিহাস*, এবং বিশেষ করে শেখাতে হবে এই তথ্যটা যে সে ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি করা অসম্ভব। আব্বাসী ওম্মাই যুগের ভেতর দিয়ে মুসলিম সংস্কৃতি যে-রূপ নিয়েছে সে-রূপ পূর্ব পাকিস্তানে আবার নেবে না। অথচ ইসলামের গণতন্ত্রের খুঁটি এবং ধনবণ্টনে সমতার নোঙ্গর জোর পাকড়ে ধরে থাকতে হবে।

২. শত শত বৎসরের জ্ঞানবিজ্ঞানচর্চা করে ইয়োরোপ যে শক্তি সঞ্চয় করতে, মিশর দমস্ক আজ তাই শিখতে ব্যস্ত। প্রাচীন ঐতিহ্য যে রকম প্রশ্ন জিজ্ঞেস না করে গ্রহণ করা যায় না, ইয়োরোপীয় কর্ম এবং চিন্তাপাদ্ধতি ঠিক সেই রকম বিনা বিচারে গ্রহণ করা চলবে না।

৩. ইসলাম আরবের বাইরে যেখানেই গিয়েছে সেখানেই তথাকার দেশজ জ্ঞানবিজ্ঞান, শিল্পকলাকে গ্রহণ করে নূতন সভ্যতা সংস্কৃতি নির্মাণ করেছে। ইরানের সুফীতত্ত্বের যশ কোন দেশে পৌঁছায় নি? তাজমহল এই করেই নির্মিত হয়েছে, উর্দুভাষা এই পদ্ধতিতেই গড়ে উঠল, খেয়াল গান এই করেই গাওয়া হল, মোগল ছবি এই করেই পৃথিবীকে মুগ্ধ করেছে। পূর্ব পাকিস্তানের ভারতীয় ঐতিহ্য নগণ্য নয়, অবহেলনীয় নয়। পূর্ববঙ্গের বহু হিন্দু ভারতবর্ষের ইতিহাসে স্বনামধন্য হয়েছেন, তাঁদের বংশধরগণ যেদিন নবীন রাষ্ট্রে আসন গ্রহণ করে সভ্যতাকৃষ্টি আন্দোলনে যোগ দেবেন সেদিনই উভয় সম্প্রদায়ের অর্থহীন তিক্ততার অবসান হবে। (এস্থলে অবান্তর হলেও বলি ঠিক, তেমনি ভারতীয় ইউনিয়নের মুসলমানদের অবহেলা করেও সে রাষ্ট্র পরিপূর্ণতায় পৌঁছতে পারবে না) একথা কিছুতেই ভুললে চলবে না যে মামুন, হারুনের সময় যখন আরবেরা 'জ্ঞান-গরিমায় পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ সন্তান ঠিক তখনই তারা প্রচুর অর্থ ব্যয় করে 'চরক' 'সুশ্রুত' 'পঞ্চতন্ত্র' আরবীতে অনুবাদ করেছিল, গজনীর মাহমুদের আমলে ঐতিহাসিক আল-বীরুনী কী বিপুল পরিশ্রম করে সংস্কৃত শিখে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে প্রমাণিক গ্রন্থ লিখেছিলেন।

* পাকিস্তানকে theocratic রাষ্ট্র করার কথা উঠছে না। আমার ব্যক্তিগত দৃঢ় বিশ্বাস, ধর্মের নামে যে রাজনৈতিক ধাপ্পা, অর্থনৈতিক শোষণ চলে তার শেষ কোনদিনই হবে না, যতদিন না দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায় ধর্মালোচনায় প্রবৃত্ত হন। ভারতীয় ইউনিয়ন সম্বেন্ধে ও এই নীতি প্রযোজ্য।

আরবেরা সমুদ্র উত্তীর্ণ হয়ে ভারতীয় সভ্যতার অনুসন্ধানে এসেশে এল, আর আজ পূর্ব পাকিস্তানের লোক বাংলা ভাষার গায়ে বৈষ্ণব নামাবলী দেখে ভড়কে যাচ্ছে! কিমাশ্চর্যমতঃপরম্?

কত গবেষণা, কত সৃজনীশক্তি, কত শাস্ত্রাশাস্ত্র বর্জন গ্রহণ, কত গ্রন্থ নির্মাণ, কত পুস্তিকা প্রচার, কত বড় বিরাট, সর্বব্যাপী, আপামর জনসাধারণ সংযুক্ত বিরাট অভিযানের সামনে দাঁড়িয়ে পূর্ব পাকিস্তান!

এর উৎসাহ অনুপ্রেরণা যোগাবে কে?

প্রধানত সাহিত্যিকগণ। এবং আমি বিশেষ জোর দিয়ে জানাতে চাই সে সাহিত্য-সৃষ্টি মাতৃভাষা ভিন্ন অন্য কোনো ভাষাতে হতে পারে না।

আবার ইতিহাস থেকে নজীর সংগ্রহ করি।

ফ্রান্স এবং ইংলণ্ডে আঠারো মাইলের ব্যবধান। প্রতি বৎসর হাজার হাজার ইংরেজ প্যারিসে বেড়াতে আসে। বায়রন শেলি উত্তম ফরাসী জানতেন কিন্তু কই, আজ পর্যন্ত তো একজন ইংরেজ ফরাসী সাহিত্যে নাম অর্জন করতে পারেন নি, আজ পর্যন্ত একজন ফরাসী ইংরেজী লিখে পাঁচজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারেন নি। অথচ বাংলা উর্দুতে যে পার্থক্য ফরাসী-ইংরেজীতে পার্থক্য তার চেয়ে ঢের কম। ফ্রেডরিক দি গ্রেটের যুগে বার্লিন এবং ভিয়েনার শিক্ষিত লোক মাত্রই ফরাসীচর্চা করত (আমরা যতটা ইংরেজী করি তার চেয়ে ঢের বেশী), কিন্তু তবুও তো একজন জর্মন ভাষাভাষী ফরাসী লিখে নাম করতে পারেন নি, তুর্গেনিয়েফ, তলস্তয়ের আমলে রুশ অভিজাত মাত্রই ফরাসী গভর্ণেসের হাতে বড় হতেন, বাল্যকাল হতে ফরাসী লিখতেন (তলস্তয়ের রুশ পুস্তকে যে পরিমাণ পাতার পর পাতা সির্ফ ফরাসী লেখা আছে সে রকম ইংরেজী-ভর্তি বাংলা বই আমাদের দেশে এখনো বেরোয় নি) কিন্তু তৎসত্ত্বেও একজন রুশ ফরাসীতে সার্থক সৃষ্টিকার্য করতে পারেন নি।

অত দূরে যাই কেন? সাত শত বৎসর ফার্সীর সাধনা করে ভারতবর্ষের সাহিত্যিকেরা এমন একখানা বই লিখতে পারেন নি যে বই ইরানে সম্মান লাভ করেছে। যে গালিব আপন ফার্সীর দম্ভ করতেন তাঁর ফার্সী কবিতা ইরানে অনাদৃত, অপাঙ্‌ক্তেয়, অথচ মাতৃভাষায় লেখা তাঁর উর্দু কবিতা অজর অমর হয়ে থাকবে।

আরো কাছে আসি। মাইকেলের মত বহু ভাষায় সুপণ্ডিত দ্বিতীয় বাঙালী এদেশে জন্মান নি। তাঁর পূর্বে বা পরে কোনো বাঙালী তাঁর মত ইংরিজি লিখিতে পারেন নি, তবু দেখি আপ্রাণ চেষ্টা করে তিনিও ইংরিজী সাহিত্যের ইতিহাসে এতটুকু আঁচড় কেটে যেতে পারেন নি। অথচ অল্পায়াসে লেখা তাঁর 'মেঘনাদ' বাংলা সাহিত্য থেকে কখনও বিলুপ্ত হবে না।

আরো কাছে, একদম ঘরের ভেতর চলে আসি। লালন ফকীরও বলেছেন, 'ঘরের কাছে পাইনে খবর, খুঁজতে গেলেম দিল্লী শহর।' পূর্ব পাকিস্তানের আপন ঘরের মৌলবী-মৌলানারা যে শত শত বৎসর ধরে আরবী, ফারসী এবং উর্দুর চর্চা করলেন, এসব সাহিত্যে তাঁদের অবদান কি? গালিব, হালী, ইকবালের কথা বাদ দিন, পূর্ব পাকিস্তান থেকে একজন দুসরা দরজার উর্দু কবি দেখাতে পারলেই আমরা সন্তুষ্ট হয়ে যাব।

মৌলবী-মৌলানাদের যে কাঠগড়ায় দাঁড় করালুম তাঁর জন্য তাঁরা যেন আমার উপর

অসন্তুষ্ট না হন। নও-জোয়ানরা তাঁদের শ্রদ্ধা করুক আর নাই করুক, আমি তাঁদের অত্যন্ত শ্রদ্ধার চোখে দেখি। উত্তর এবং পশ্চিম ভারতের ('হিন্দুস্তানের') বহু মৌলবী-মৌলানার সংস্রবে এসে আমার এ বিশ্বাস আরো বদ্ধমূল হয়েছে যে, পূর্ববঙ্গের আলিম সম্প্রদায় শাস্ত্রচর্চায় তাঁদের চেয়ে কোনো অংশে কম নন। যেখানে সম্পূর্ণ বিদেশী ভাষা নিয়ে কারবার যেমন মনে করুন আরবী—যেখানে পূর্ববঙ্গের আলিম অনেক স্থলেই 'হিন্দুস্তানের' আলিমকে হার মানিয়েছেন কিন্তু উর্দুতে সাহিত্য সৃষ্টি তো সম্পূর্ণ আলাদা জিনিস। যে স্পর্শকাতরতা, সূক্ষ্মানুভূতি, হৃদয়াবেগ মাতৃভাষার ভেতর দিয়ে পরিস্ফুট হয়ে সাহিত্য সৃষ্টি করে সেসব তাঁদের আছে কিন্তু উর্দু তাঁদের মাতৃভাষা নয় বলে তাঁদের সর্বপ্রচেষ্টা পঙ্গু, আড়ষ্ট ও রসবর্জিত হয়ে যে রূপ ধারণ করে তাকে সাহিত্য বলা চলে না। বিয়ের 'প্রীতি-উপহারেই' তার শেষ হদ্।

অথচ দেখি অতি যৎসামান্য আরবী-ফার্সীর কল্যাণে কাজী নজরুল বাংলা সাহিত্যে কী অক্ষয় খ্যাতি অর্জন করলেন। মুসলমানও যে বাংলাতে সফল সাহিত্য সৃষ্টি করতে পারে সে তথ্য একা কাজী সাহেবেই সপ্রমাণ করে দিয়েছেন।

তাই পুনরায় বলি, মাতৃভাষার সাহায্য ব্যতিরেকে কেউ কখনো, কোনো দেশে সার্থক সাহিত্য সৃষ্টি করতে পারেন নি। আজ যদি আমাদের সাহিত্য প্রচেষ্টা উর্দু স্বর্ণমৃগের পশ্চাতে ধাবমান হয় তবে তার চরম অবসাদ হবে অনুর্বর মরুভূমিতে। সমস্ত উনবিংশ ও এ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত বাংলা ভাষা ও সাহিত্য উর্ধ্বশ্বাসে প্রগতির দিকে ছুটে চলল; অর্থাভাবে শিক্ষার অভাবে, দুঃখের তাড়নায় বাঙালী মুসলমান সে কাফেলাকে এগিয়ে যেতে দেখল কিন্তু সঙ্গী হতে পারল না। এখনো কি সময় হয় নি যে সে তার সৃজনশক্তির সদ্ব্যবহার করার সুযোগ পায়?

অথচ দেখি, অশিক্ষিত চাষা এবং অর্ধশিক্ষিত মুন্সীমোল্লা আপন সাহিত্যে সৃষ্টি করে গিয়েছেন। পূর্ববঙ্গের লোকসাহিত্য যখন বিশ্বজনের সম্মুখে আত্মপ্রকাশ করল তখন দেশবিদেশে বহু রসিকজন তার যে প্রশংসা করলেন সে প্রশংসা অন্য কোনো দেশের লোকসাহিত্যের প্রতি উচ্ছ্বসিত হয় নি। ভাষার বাজারে বহু বৎসর ধরে এ অধম বড় বড় মহাজনদের তামাক সেজে ফাই-ফর্মাস খেটে দিয়ে তাঁদের আড়তের সন্ধান নিয়েছে, এবং সে হলপ খেয়ে বলতে প্রস্তুত, লোকসাহিত্যের ফরাসী, জর্মন, ইতালি, ইংরেজী আড়তের কোনোটিতেই পূর্ববঙ্গ লোকসাহিত্যের মত সরেস মাল নেই।

আমাদের ভাটিয়ালি মধুর কাছে ভলগার গান চিটেগুড়—হাসন রাজা, লালন ফকীর, সৈয়দ শাহনূরের মজলিসে এসে দাঁড়াতে পারেন এমন একজন গুণীও ইয়োরোপীয় লোকসাহিত্য দেখাতে পারবে না।

অথচ কী আশ্চর্য, কী তিলিস্মাৎ, পূর্ববঙ্গের মুসলিম শিক্ষিত সম্প্রদায় কিছুই রচনা করতে পারলেন না! উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত পূর্ববঙ্গে শিক্ষিত বলতে বোঝাত উর্দুসেবিগণ, তারপরের দুঃখ-দৈন্যের ইতিহাস তো পূর্বেই নিবেদন করেছি। কাজেই যাঁরা শত শত বৎসর ফার্সী এবং উর্দুর সেবা করে কোনো সাহিত্য সৃষ্টি করতে পারেন নি, অন্তত তাঁদের মুখে একথা শোভা পায় না যে বাঙালী মুসলমান বাংলা সাহিত্যের সেবা করে সে ভাষাকে আপন করে নিতে পারে নি।

কিন্তু কার দোষ বেশী, আর কার দোষ কম সেকথা নিয়ে এখানে আর আলোচনা করব না। এখানে শুধু এইটুকু নিবেদন করি: যে দেশের চাষী-মাঝি ভুবনবরেণ্য লোকসঙ্গীত রচনা করতে পারল সে দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায় সফল সাহিত্য রচনা করতে পারবে না সেকথা কি কখনো বিশ্বাস করা যায়? ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা বলতে বাধো বাধো ঠেকে কিন্তু না বলে উপায় নেই, তাই অতি সবিনয় নিবেদন করছি, খুদাতা'লা এ অধমের জন্য বহু দেশে রুটি রেখেছিলেন। আরব, মিশর, আফগানিস্তান, ফ্রান্স, জর্মনী প্রভৃতি নানা দেশে নানা পণ্ডিত নানা সাহিত্যিকের সেবা করে এ অধমের ধ্রুব বিশ্বাস জন্মেছে পূর্ববঙ্গে সাহিত্য সৃষ্টির যে উপাদান আছে এবং পূর্ববঙ্গবাসীর হৃদয়মনে যে সামান আছে তার বদৌলতে একদিন সে অতি উচ্চাঙ্গের সাহিত্য সৃষ্টি করবে।

সোয়া চার কোটি মানুষ সাহিত্য সৃষ্টির জন্য উন্মুখ হয়ে আছে। বহুশত বৎসর ধরে তাদের আতুর হিয়া প্রকাশের জন্য আকুলি-বিকুলি করেছে, কখনো ফার্সী, কখনো উর্দুর মরু পথে তাদের ফল্গুধারা উষ্ণবাষ্পে পরিণত হয়ে গিয়েছে, আজ সেসব ফল্গু শুধু মর্মবাণীরই সন্ধানে নয়, আজ নবরাষ্ট্র নির্মাণের প্রদোষে তারা ওজস্বিনী ভাষায় দেশের জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করে তুলতে চায়।

হাঙ্গেরীর জাতীয় সঙ্গীতে আছে:

দেশের দশের ডাক শোনা ঐ ওঠা ওঠা মাডিয়ার
এই বেলা যদি পারো তো পারিলে না হলে হ'ল না আর।

আমি বলি;

দেশের ভাষার ডাক শোনো ঐ হে তরুণ বাংলার
এই বেলা যদি পারো তো পারিলে না হলে হ'ল না আর।

এই বিরাট সাহিত্য নির্মাণের সম্মুখে দাঁড়িয়ে পাকিস্তানী তরুণ যেন সাহস না হারায়। সে যেন না ভাবে যে উর্দু গ্রহণ করলে তার সব মুশকিল আসান হয়ে যেত। সাহিত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান বাবদে ইংরেজী ঢের বেশী মুশকিল আসান। উর্দুতে আছে অল্প বিস্তর মসলা-মাসাইলের কেতাব, এন্তার দোয়া দরুদের বই। তুমি যে রাষ্ট্র নির্মাণ করতে যাচ্ছ তার মালমসলা উর্দুতে যা পেতে সে জিনিস সৃষ্টি করতে তোমার পাঁচ বছরও লাগবে না। ইরান দেশ যে রকম একদিন ইরানী সভ্যতা নির্মাণ করে ফিরদৌসী, রুমী, হাফিজ, সাদী, খৈয়ামের জন্ম দিয়েছিল সেই রকম তুমিও সম্মুখে আদর্শ রাখবে পূর্ব পাকিস্তানে এক নূতন সভ্যতা গড়বার। ইরান আরবী এবং ফার্সী দুই মিলিয়ে তার সাহিত্য-সংস্কৃতি গড়েছিল, তুমি আরবী বাংলা, ফার্সী, সংস্কৃত, উর্দু, ইংরেজী মিলিয়ে ব্যাপকতর এবং মধুর সাহিত্য-সংস্কৃতি সৃষ্টি করবে।

অন্যান্য সম্প্রদায় যেন অযথা ভয় না পান। বৌদ্ধচর্যাপদের সূতিকাগৃহে যে শিশুর জন্ম, বৈষ্ণবের নামাবলী যে শিশুর অঙ্গে বিজড়িত, আরবী ফারসীর রুটি গোস্ত যে শিশু বিস্তর খেয়েছে, 'গীতাঞ্জলি'র একেশ্বরের বন্দনা গেয়ে গেয়ে যে শিশু যৌবনে পৌঁছল, সে যুবক ইসলামের ইতিহাস চর্চা করলে কোনো মহাভারত অশুদ্ধ হবে না। রাধাকৃষ্ণন, সুরেন দাশগুপ্ত যেসব দর্শনের কেতাব ইংরেজীতে লিখেছেন তাতে বিস্তর সংস্কৃত শব্দ

আছে, মার্গোলিয়াত মুইর ইসলাম সম্বন্ধে যেসব গ্রন্থ ইংরেজীতে লিখেছেন তাতেও বিস্তর আরবী শব্দ আছে, তাই বলে ইংরেজী ভাষার জাত যায় নি। ভারতচন্দ্র তাঁর কাব্যে যে পরিমাণ আরবী ফার্সী শব্দ প্রয়োগ করেছেন সে পরিমাণ যদি পুনরায় কাজে লাগে তা হলে আপত্তি কি ? 'আলালের ঘরের দুলাল'ও তো বাংলা বই।

রামমোহন রায় বাংলা ভাষায় যে চিন্তাধারা প্রবর্তন করেছিলেন তার বিরুদ্ধে সেযুগে গোঁড়া হিন্দুরা প্রবল আপত্তি তুলেছিলেন রামকৃষ্ণদেবকে কেন্দ্র করে বাংলা ভাষায় যে নবচেতনার উৎপত্তি হয়েছিল তখনকার বিদগ্ধ(প্রধানত ব্রাহ্মণ) সমাজ সেটাকে গ্রহণ করতে চান নি, এবং রবীন্দ্রনাথ সনাতন ঐতিহ্যপন্থী নন বলে তাঁকে পর্যন্ত সুরেশ সমাজপতি, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, শরৎ চট্টোপাধ্যায়ের হাতে লাঞ্ছনা ভোগ করতে হয়েছিল। আজ এসব সংগ্রামের কথা লোকে ভুলে গিয়েছে, এবং বাংলা সাহিত্যে এখন যদি মুসলিম সংস্কৃতির (এবং সেইটেই যে তার একমাত্র প্রচেষ্টা হবে তাও নয়) আলোচনা হয় তা হলে বিচক্ষণ লোক বিভিষিকা দেখবেন না।

আমার মত অজ্ঞ লোককে বহু হিন্দু-মুসলমান যখন বাংলাতে মুসলিম সংস্কৃতি সম্বন্ধে আলোচনা করতে অনুরোধ জানিয়ে থাকতে পারেন তখন যোগ্যজন এ কর্মে নিয়োজিত হলে যে বহুলোক তাঁকে আশীর্বাদ করবেন তাতে আর কি সন্দেহ ?

পূর্ব পাকিস্তানে তা হলে উর্দুর স্থান কোথায় ?

প্রথমত বলে রাখা ভালো যে, বর্তমানে আমাদের দেশে যে শিক্ষাপদ্ধতি প্রচলিত আছে তার সঙ্গে আমাদের পরিকল্পনার শিক্ষাপদ্ধতির কোনো তুলনাই হতে পারে না। উপস্থিত দেখতে পাই, ইস্কুলে চার বৎসর এবং কলেজে চার বৎসর একুনে আট বৎসর পড়েও সাধারণ ছাত্র চলনসই আরবী বা সংস্কৃতি শিখতে পারে না। কাজেই যখন বলি উর্দু অপ্‌শনাল ভাষা হিসেবে ম্যাট্রিকের শেষের চার শ্রেণীতে পড়ানো হবে তখন উর্দুওয়ালারা যেন না ভাবেন যে ছাত্রদের উর্দুজ্ঞান আমাদের গ্রাজুয়েটদের ফার্সী জ্ঞানেরই মত হবে। কলেজেও উর্দুর জন্য ব্যাপক বন্দোবস্ত থাকবে। একথা ভুললে চলবে না যে পাকিস্তানের কলেজে 'ভারতীয় মুসলিম সংস্কৃতি' নামক এক বিশেষ বিষয়বস্তু পড়ানো হবে। মোগল স্থপতি, চিত্রকলা, সঙ্গীত যে রকম সকলেরই গর্বের বিষয় (কোনো ইংরেজ বা মার্কিন যখন তাজমহলের প্রশংসা করে তখন কোনো হিন্দু তো তাজমহল মুসলমানের সৃষ্টি বলে নিজেকে সে দায় থেকে মুক্ত করেন না, রবীন্দ্রনাথের নোবেল প্রাইজ পাওয়া সম্বন্ধে কথা উঠলে কোনো বাঙালী মুসলমানকে 'রবীন্দ্রনাথ হিন্দু' বলে নতশির হতে তো দেখি নি; অবনীন্দ্রনাথ মোগল শৈলীতে ছবি আঁকেন, তাঁর শিষ্য নন্দলাল অজন্তা শৈলীতে, তাই বলে একথা কারো মুখে শুনি নি যে নন্দলাল গুরুর চেয়ে বড় চিত্রকার) ঠিক তেমনি উর্দু ভাষা এবং সাহিত্য হিন্দু-মুসলমান উভয়েরই শ্লাঘার সম্পদ। যেসব ছাত্র ইতিহাস, অর্থনীতি, সমাজতত্ত্ব অথবা আরবী ফারসী সাহিত্য অধ্যয়ন করবে তাদের বাধ্য হয়ে উর্দুর প্রতি মনযোগ দিতে হবে। বেশীরভাগ রাজনৈতিক এবং কেন্দ্রীয় পরিষদে জানেওয়ালা সদস্য এইসব বিষয়ের সঙ্গে ছাত্রজীবনে সংযুক্ত থাকবেন বলে উর্দুর সঙ্গে তাদের যথেষ্ট পরিচয় হবে। যাঁরা ভাষা ব্যাপারে অসাধারণ মেধাবী তাঁরা হয়তো করাচীতে উর্দুভাষায় বক্তৃতা দেবেন কিন্তু অধিকাংশ সদস্যকে কেন বাংলাতেই বক্তৃতা দিতে হবে এবং সেজন্য যে 'অসুবিধা' হবে সেটা কি করে সরাতে হবে তার আলোচনা প্রবন্ধের গোড়ার দিকেই সবিস্তর করেছি।

কেন্দ্রের চাকরি সম্বন্ধে বক্তব্য, যেদিন পূর্ব-পশ্চিম উভয় পাকিস্তান থেকে ইংরেজী অন্তর্ধান করবে সেদিন পাঞ্জাবী মুসলমান পূর্ব পাকিস্তানে যে প্রকার চাকরি করবে পূর্ব পাকিস্তানের লোক ঠিক সেই প্রকারেই কেন্দ্রে চাকরি করবে। এবং একথা তো কেউ অস্বীকার করবেন না যে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বদৌলতে আমরা আরবী ফারসীর ভেতর দিয়ে উর্দুর সঙ্গে যুক্ত আছি এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভেতর দিয়েও থাকব কিন্তু পাঞ্জাবী সিন্ধীর সে রকম বাংলার সঙ্গে যুক্ত হওয়ার কোনো ঐতিহ্য নেই। কাজেই প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আমরা হারব কেন? কিন্তু এ বিষয়ে অতিরিক্ত কাব্য ব্যয় করার প্রয়োজন নেই। উর্দুওয়ালারাই স্বীকার করে নিয়েছেন যে, সকল অবস্থাতেই বাঙালীর জন্য করাচীতে ওয়েটেজ থাকবে। অর্থাৎ স্বয়ং উর্দুওয়লারাই মেনে নিচ্ছেন যে আমরা প্রাণপণ উর্দু শিখলেও পশ্চিম পাকিস্তানী উর্দুভাষাভাষীদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে পারব না। তাঁদের এই মেনে নেওয়াটা খুব সম্ভব ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা প্রসূত। আমরাও বলি, আমাদের আলিম-ফাজিলগণ যখন উর্দুতে যুক্তপ্রদেশের মৌলবিগণকে পরাজিত করতে পারেন নি, তখন আমাদের মত 'তিফ্‌লে মক্‌তব্', 'কমসীনদের' দিয়ে কোন্ জঙ্গ-ই-জবান্ জয় সম্ভবপর ?

এ সম্পর্কে আরেকটি কথা বলে রাখা ভালো। পরাধীন এবং অনুন্নত দেশেই চাকরি নিয়ে মাথা-ফাটাফাটি খুন-রেজী। ব্যবসা বাণিজ্য শিল্পকলা, কৃষি-খনিজ, দুগ্ধ-ঘৃত উৎপাদন করে যে-দেশ সমৃদ্ধিশালী সে-দেশে চাকরি করে অল্প লোক তাদের সম্মানও অনেক কম। দৃষ্টান্তস্বরূপ অঙ্গুলি নির্দেশ করি চাটগাঁয়ের দিকে। পাকিস্তান হয়েছে মাত্র এক বছর—এর মাঝেই শুনতে পাই চাটগাঁয়ের কোনো কোনো বড় সরকারী কর্মচারী নোকরি ছেড়ে দিয়ে ব্যবসা আরম্ভ করার জন্য উদগ্রীব হয়ে আছেন। দেশ সমৃদ্ধশালী হলে কটা লোক বিদেশ যায়,তাও আবার চাকরির সন্ধানেই ? দেশের ভেতরেই দেখতে পাই, যে বৎসর খেত-খামার ভালো হয় সে বৎসরে শহরে বাসায় চাকরের জন্য হাহাকার পড়ে যায়।

মুসলিম ঐতিহ্যও চাকরির প্রশংসা করে নি, প্রশংসা করেছে ব্যবসা-বাণিজ্যের। ইসলাম দেশদেশান্তরে বিস্তৃতিলাভ করেছে ধর্মপ্রচারকদের কর্মতৎপরতায় এবং সদাগরদের ধর্মানুরাগে। এখনো মধ্য আফ্রিকায় ক্রীশ্চান মিশনারিদের সঙ্গে পাল্লা দিচ্ছে হাতীর দাঁতের ব্যবসায়ী মুসলমান সদাগরেরা। ক্রীশ্চান মিশনারিরা সবাই মাইনে পায়, তারা চাকুরে। তাদের দুঃখের অন্ত নেই যে তারা সদাগরদের সঙ্গে পেরে উঠছে না।

পূর্ব পাকিস্তানের আদর্শ কি সে সম্বন্ধে বিচার করার সময় উর্দুওয়ালা একটা ভয়ঙ্কর জুজুর ভয় দেখান। তাঁরা বলেন, পূর্ব পাকিস্তান যদি উর্দু গ্রহণ না করে তবে সে পশ্চিম পাকিস্তান তথা কেন্দ্র থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে এবং তারি সুযোগে ভারতীয় ডোমনিয়ন পূর্ব পাকিস্তানটিকে বিনা নুন-লঙ্কায় কপাৎ করে গিলে ফেলবে।

ভারতীয় ইউনিয়নে এবং পাকিস্তানে লড়াই হবে কিনা, হলে কবে হবে এ আলোচনায় এত 'যদি' এবং কিন্তু আছে যে সে আলোচনা যুক্তি তর্কের বিষয়বস্তু না হয়ে ফলিত জ্যোতিষের ভবিষ্যদ্বাণীর জিনিস হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমরা ফলিত জ্যোতিষ জানিনে, উপস্থিত আমরা ধরে নিচ্ছি যে লড়াইটা লাগবে, কারণ সেটা ধরে না নিলে জুজুর ভয় ভাঙানো যাবে না। অন্ধকার ঘরে বাচ্চা ছেলেকে 'ভূত নেই' বললে তার ভয় যায় না,

বরঞ্চ ভূত মেনে নিলেও আপত্তি নেই যদি সঙ্গে সঙ্গে আলো জ্বালানো হয়। তাই আলোর সন্ধানই করা যাক।

কে মিত্র, কে শত্রু সে কি ভাষার উপরই নির্ভর করে? আমেরিকা, ফ্রান্স, রুশ, লড়ল জর্মন, ইতালির বিরুদ্ধে। আমেরিকা ফ্রান্স এবং রুশ তাই বলে কি একই ভাষায় কথাবার্তা কয়, না জর্মনী ইতালির ভাষাই বা এক? আজ বলছি রুশের বিরুদ্ধে ধনতান্ত্রিক ফ্রান্সের একমাত্র ভরসা মার্কিন সাহায্য। আজ যদি উর্দুওয়ালাদের কায়দায় ফ্রান্সকে বলা হয়, 'তোমরা যদি ইংরেজী গ্রহণ না করো তবে তোমরা আমেরিকা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে, এবং রুশ ফ্রান্সটিকে বিনা মাস্টার্ডে কপাৎ করে গিলে ফেলবে, তা হলে কি ফ্রান্সের লোক মাতৃভাষা বর্জন করে মাথায় গামছা বেঁধে ইংরেজী শিখতে লেগে যাবে?

পক্ষান্তরে এক ভাষা হলেই তো হৃদ্যতা চরমে পৌঁছয় না। আমেরিকা যখন ইংরেজের বিরুদ্ধে স্বাধীনতার লড়াই লড়েছিল তখনো সে ইংরেজী বলত। আইরিশমেনের মাতৃভাষা ইংরেজী, তাই বলে সে কি ইংরেজের বিরুদ্ধে লড়ে নি? পশতুভাষী মুসলিম পাঠানের একদল লড়ল সুভাষচন্দ্রের ঝাণ্ডার নীচে দাঁড়িয়ে জাপানের হয়ে, আরেকদল লড়ল ইংরেজের ঝাণ্ডার নীচে দাঁড়িয়ে তাদের হয়ে।

তার চেয়েও ভালো উদাহরণ আছে আরব দেশে। আরবের লোক কথা বলে আরবী ভাষায়, তারা সকলেই এক এক গোষ্ঠীর লোক (একবর্ণ), তারা সকলেই মুসলিম অথচ আজ সে দেশ (১) ইরাক, (২) সিরিয়া, (৩) লেবানন, (৪) ফিলিস্তীন, (৫) ট্রান্স-জর্ডন, (৬) সউদী-আরব, (৭) ইয়েমেনে খণ্ডিত বিখণ্ডিত (এগুলো ছাড়া আরবী-ভাষাভাষী মিশর, টুনিস, আলজেরিয়া, মরক্কোও রয়েছে)।

এই সাত রাষ্ট্রের মধ্যে মন-কষাকষির অন্ত নেই। ইবনে সউদ এবং মক্কা শরীফের মধ্যে যে লড়াই হয়েছিল সে তো আমাদের সকলেরই স্পষ্ট মনে আছে। তার জের এখনো চলছে আমীর আব্দুল্লা এবং ইবনে সউদের শত্রুতার মধ্যে। আজ যে ফিলিস্তীন অসহায় হয়ে ইহুদির হাতে মার খাচ্ছে তার প্রধান কারণ এই যে ইবনে সউদ আর আব্দুল্লার মধ্যে ঠিক ঠিক মনে মিল হচ্ছে না। আরব লীগে সর্বপ্রচেষ্টা ব্যর্থ হচ্ছে—অথচ সকলেই জানেন যে উপযুক্ত রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে সমঝাওতা হয়ে গেলে দশ দিনের ভেতর ইহুদিদের রাজ্যলিপ্সা 'ফি নারি জাহান্নামে' পাঠানো সম্ভবপর হবে।

পক্ষান্তরে সুইজারল্যাণ্ডে তিনটি (চতুর্থটির লোকসংখ্যা অত্যন্ত কম) ভাষা-বেলজিয়ামে দুইটি, চেকোশ্লোভাকিয়ায় দুইটি, যুগোশ্লোভাকিয়ায় গোটা চারেক, কানাডায় দুইটি ইত্যাদি ইত্যাদি। সুইজারল্যাণ্ডের দৃষ্টান্ত বিশেষ করে দ্রষ্টব্য। সে দেশের প্রধান দুই অংশ জর্মন এবং ফরাসী বলে। বন্দোবস্ত থাকা সত্ত্বেও একে অন্যের ভাষা সাধারণত রপ্ত করতে পারে না (ভাষা শেখা বাবতে সুইস্‌রা বড়ই কাহিল),অথচ ফ্রান্স এবং জর্মনীতে যখন লড়াই লাগে তখন ফ্রেঞ্চ সুইস্‌রা একথা কখনো বলে নি যে তারা ফ্রান্সের হয়ে লড়বে, জর্মন সুইসরাও অনুরূপ ভয় দেখায় নি। গত যুদ্ধে দুজনে মিলে নিরপেক্ষ ছিল এবং হিটলার জানতেন যে সুইস-জর্মন যদিও তাঁর জাতভাই তবু তাদের কাছ থেকে সাহায্য পাওয়া যাবে না।

তাই বলি unity (ঐক্য) ও uniformity (সমতা) এক জিনিস নয়। সমতা হলেই

ঐক্য হয় না। আর যারা সমতা চায় তাদের জেদ-বয়নাক্কার অন্ত নেই। আজ তারা বলবে ভাষায় সমতা চাই, পূর্ব পাকিস্তান উর্দু নাও; কাল বলবে পোশাকের সমতা চাই, শেলওয়ার কুর্তা পাগড়ী পরো; পরশু বলবে খাদ্যের সমতা চাই, মাছ ভাত ছেড়ে গোস্ত রুটি ধরো; তার পরদিন বলবে নৌকা বদখদ্ জিনিস, তার বদলে গোরুর গাড়ী চালাও। তারপর যদি একদিন পূর্ব পাকিস্তানী পাঞ্জাবীদের বলে, দৈর্ঘ্যের সমতা হলে আরো ভালো হয়, লড়াইয়ের জন্য য়ুনিফর্ম বানাতে তা হলে সুবিধে হবে, কিন্তু তোমরা বড্ড উঁচু, তোমাদের পায়ের অথবা মাথার দিকের ইঞ্চি তিনেক কেটে ফেলো।, তা হলেই হয়েছে!

ঐক্য বা য়ুনিটি অন্য জিনিস! প্রত্যেকে আপন বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে যখন সংঘবদ্ধ হয়ে মানুষ একই স্বার্থ, একই আদর্শের দিকে ধাবমান হয় তখনই তাকে বলে ঐক্য। তুলনা দিতে গিয়ে গুণীরা বলেছেন, বীণায় প্রত্যেক তারের আপন আপন ধ্বনি আছে– সব তার যখন আপন আপন বিশিষ্ট ধ্বনি সপ্রকাশ করে, একই সুরের ভেতর দিয়ে আত্মপ্রকাশ করে তখনই সৃষ্ট হয় উচ্চাঙ্গের সঙ্গীত। সব কটা তারই যদি এক ধরনের বাঁধা হয় তবে বীণায় আর একতারায় কোনো তফাৎ থাকে না। সে যন্ত্র বিদগ্ধ সঙ্গীত প্রকাশ করতে অক্ষম।

পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানকে আপন আপন বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে কী প্রকারে এক আদর্শের রাখী বেঁধে সম্মিলিত করা যায় তার সাধনা করবেন রাষ্ট্রের কর্ণধারগণ। উপস্থিত শুধু আমরা এইটুকু বলতে পারি, পূর্ব পাকিস্তানের অনিচ্ছা সত্ত্বেও যদি তার ঘাড়ে উর্দু চাপানো হয় তবে স্বভাবতই উর্দু-ভাষাভাষী বহু নিষ্কর্মা শুধু ভাষার জোরে পূর্ব পাকিস্তানকে শোষণ করার চেষ্টা করবে। এ জিনিস অত্যন্ত স্বাভাবিক, তার জন্য উর্দু-ভাষাভাষীকে দোষ দিয়ে লাভ নেই— এবং ফলে জনসাধারণ একদিন বিদ্রোহ করে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। বর্ণের কৌলীন্য যেমন শোষণের কারণ হতে পারে, ভাষার কৌলীন্যও ঠিক সেই রকম শোষণপন্থা প্রশস্ততর করে দেয়।

তারি একটি মর্মন্তুদ দৃষ্টান্ত নিন : তুর্কী একদা তাবৎ আরবখণ্ডের উপর রাজত্ব করত। তুর্কী সুলতান সর্ব আরবের খলিফাও ছিলেন বটে। তৎসত্ত্বেও প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় সমস্ত আরব ভূখণ্ড খলিফার জিহাদ ফরমান উপেক্ষা করে নসারা ইংরেজদের সঙ্গে যোগ দিয়ে তুর্কীকে পর্যুদস্ত করল। আমাদের কাছে এ বড় বিস্ময়ের কথা,—খলিফার জিহাদ হুকুমের বিরুদ্ধে লড়া মানে তো কাফির হয়ে যাওয়া যে আরবদের ভেতর দিয়ে ইসলাম প্রথম সপ্রকাশ হলেন তারা ধর্মবুদ্ধি হারালো?

তাই আমাদের সবিনয় নিবেদন, পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান যেন কোনো মহত্তর আদর্শের অনুপ্রেরণায় ঐক্যসূত্রে আবদ্ধ হয়। পূর্বেই নিবেদন করেছি, গুণীরা সে আদর্শের সন্ধান করবেন। আমার জ্ঞান-অভিজ্ঞতা অত্যল্প কিন্তু নানা দেশের গুণীদের মুখে শুনেছি, নানা সৎ গ্রন্থে পড়েছি, দীন ইসলাম বলেন, সে আদর্শ হবে রাষ্ট্রের দীনদুঃখীর সেবা করা। উভয় পাকিস্তান যদি এই আদর্শ সামনে ধরে যে তাদের রাষ্ট্রভিত্তি নির্মিত হবে চাষামজুরকে অন্ন দিয়ে, দুঃস্থকে সেবাকরে, অজ্ঞকে জ্ঞানদান করে, এককথায় 'সাইল'কে (অভাবে আতুরকে) 'গুণী' (অভাবমুক্ত) করে, তা হলে আর ভয় নেই, ভাবনা নেই। উভয় প্রান্তে গণরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হলে তারা যে ঐক্যসূত্রে সম্মিলিত হবে সে সূত্র ছিন্ন হওয়ার ভয় নেই।

সেই মহান আদর্শের দিকে উদ্দীপ্ত উদ্বুদ্ধ করতে পারে সতেজ সবল সাহিত্য। সে জাতীয় সাহিত্য মাতৃভাষা ভিন্ন অন্য কোনো ভাষাতে কেউ কখনো নির্মাণ করতে পারে নি। জনগণের মাতৃভাষা উপেক্ষা করে গণরাষ্ট্র কখনই নির্মিত হতে পারে না।

উপসংহারে বক্তব্য : যুদ্ধ কাম্য বস্তু নয়। অন্যের বিনাশ বাসনা সর্বথা বর্জনীয়। পাকিস্তান বিনষ্ট হলে ভারতীয় ইউনিয়নের লাভ নেই, ভারতীয় ইউনিয়ন বিনষ্ট হলে পাকিস্তানের লাভ নেই। উভয় রাষ্ট্র সমাজতন্ত্রের ভিত্তিতে বিত্তমান হোক, এই আমাদের প্রধান কাম্য। ইয়োরোপের তাণ্ডবলীলা থেকে আমরা কি কোনো শিক্ষা গ্রহণ করব না?

শিক্ষাগ্রহণ করি আর নাই করি, কিন্তু আক্রান্ত হওয়ার ভয় অহরক বুকে পুষে সেই দৃষ্টি বিন্দু থেকে সর্ব সমস্যার সমাধান অনুসন্ধান করা মারাত্মক ভুল। বাড়ীতে আগুন লাগার ভয়ে অষ্টপ্রহর চালে জল ঢালা বুদ্ধিমানের কর্ম নয়।

আজ যদি আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কায় মাতৃভাষা বর্জন করি তবে কাল প্রাণ যাওয়ার ভয়ে মাতৃভূমি ত্যাগ করতে বাধ্য হব।

'পূর্বপাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা' প্রথম প্রকাশিত হয় বৈশাখ, ১৩৬৩ সালে বইটি প্রকাশিত হয় বইঘর ফিরিঙ্গী বাজার রোড চট্টগ্রাম থেকে। এটি ছিল একটি বক্তৃতার লিখিত ভাষ্য; এই বক্তৃতাটি তিনি দেশ বিভাগের পরপরেই ১৯৪৭ সালের ৩০শে নভেম্বর সিলেটের মুসলিম সাহিত্য সংসদের এক সভায় দিয়েছিলেন। মুজতবা আলীর মূল বক্তব্য ছিল মাতৃভাষার ব্যবহার। তিনি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন যে, এ দেশে শিক্ষার বাহন হবে বাংলা অর্থাৎ পূর্ব পাকিস্তানবাসীর মাতৃভাষা। পাকিস্তানের তথা পশ্চিম-পাকিস্তানের নেতৃবৃন্দ যখন পূর্ব পাকিস্তানে তাবৎ অধিবাসীর উপর জোর করে উর্দু চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা ও ষড়যন্ত্র করছিল, তখন 'পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা' বক্তৃতাটি সৈয়দ মুজতবা আলীর প্রতিবাদের বাস্তব নিদর্শন। তবে এই বইটিকে কেবল রাজনৈতিক প্রতিবাদ বা দলিল আখ্যা দিলে লেখকের প্রতি অবিচার করা হইবে। বইটির প্রতি পৃষ্ঠায় যে তত্ত্ব ও তথ্য পাওয়া যায় তা লেখকের দীর্ঘকালব্যাপী সুগভীর চিন্তা-সঞ্জাত।